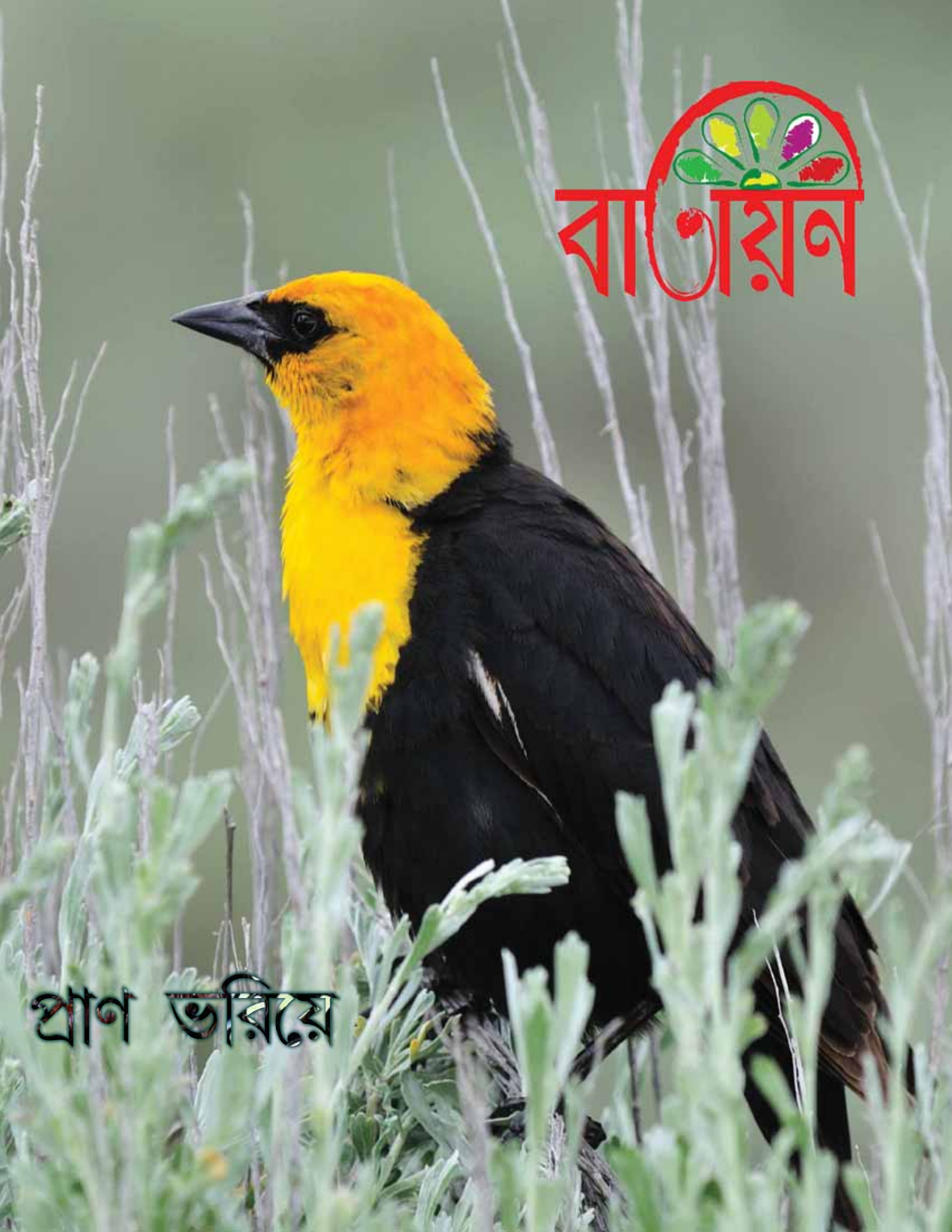

বাতায়ন

‘কেউ বা নিখাদ একাকী অন্তরা
নিঝুম ফেরে বইপত্তর কিনে
শামিয়ানার নকশা তাকে টানে
মন দিয়েছে লিটল ম্যাগাজিনে ।

--- ----- ----- ----- -----

রোদ উঠেছে শীতের সকালবেলা ।
জানলা খুলে একলা বসে ভাবি,
ফোন তুলে নিই । বন্ধুকে ফের বলি-
‘আজ বিকেলে বইমেলাতে যাবি ?’’

— শ্রীজাত
‘‘আজ দুপুরে’’

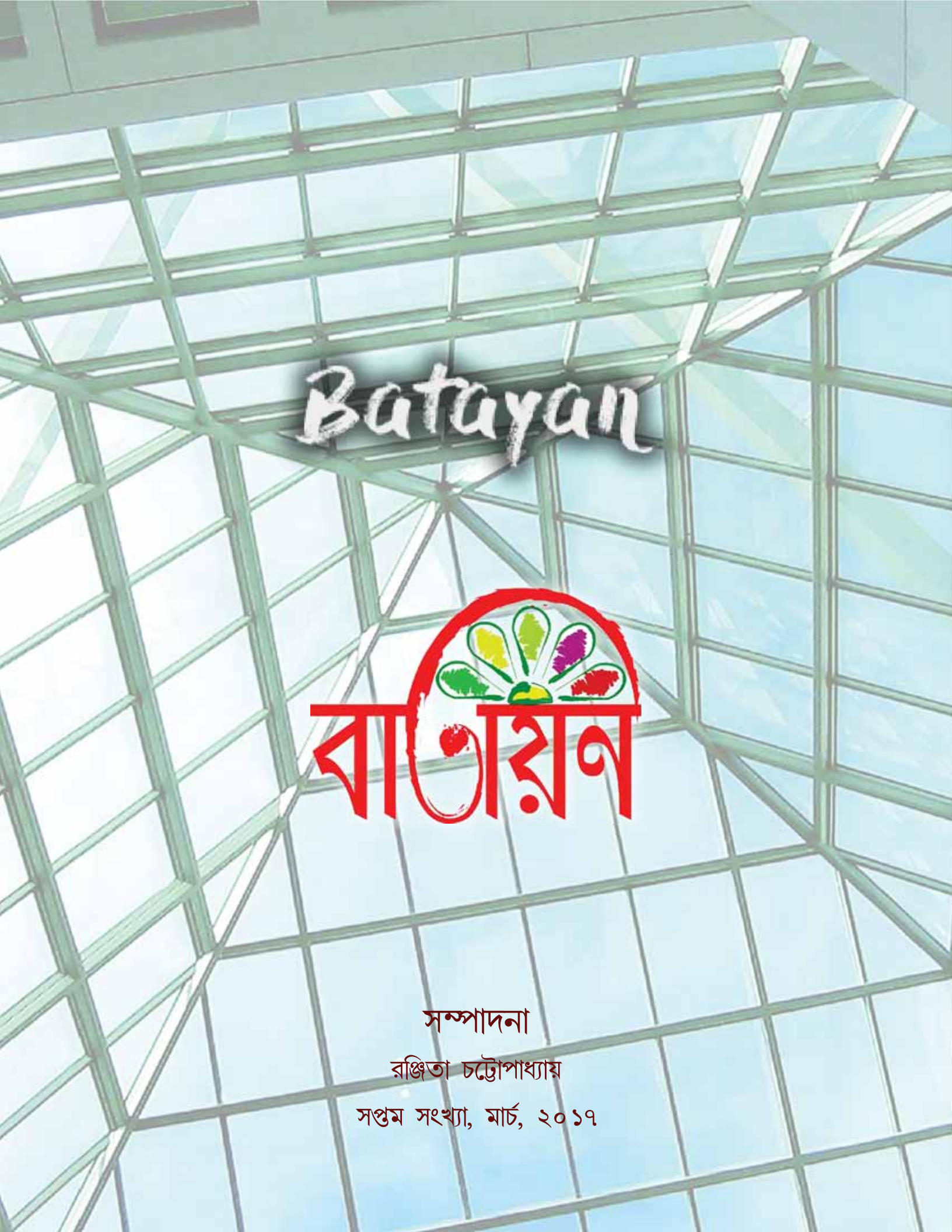

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম সংখ্যা, মার্চ, ২০১৭

Issue Number 7 : March, 2017

EDITORS
Ranjita Chattopadhyay, Chicago, IL
Jill Charles, IL, USA (English Section)

COORDINATOR
Biswajit Matilal, Kolkata, India

DESIGN AND ART LAYOUT
Kajal & Subrata, Kolkata, India

PHOTOGRAPHY
Soumen Chattopadhyay, IL, USA
Tirthankar Banerjee, Perth, Australia

PUBLISHED BY
Neo Spectrum
Anusri Banerjee, Perth, Australia
E-mail: info@batayan.org
a_banerjee@iinet.net.au

Our heartfelt thanks to all our contributors and readers for overwhelming support and response.

বাতায়ন পত্রিকা নিওস্পেক্ট্রাম দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

BATAYAN is published by Neo Spectrum. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে - - - - -’

অনন্ত মহাবিশ্বে অগুণতি সৌরজগৎ। তাদের মধ্যে একটির রাজা হলেন সূর্যদেব। আর সেই সূর্যকে মাঝে রেখে নিজের নিজের কক্ষপথে ঘুরে চলেছে নয়টি গ্রহ। এই নবগ্রহের একটি হল পৃথিবী। মহাবিশ্ব তার অসীম রহস্য নিয়ে যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে জাগিয়ে তুলেছে বিস্ময়। কিন্তু এতসব গভীর চিন্তায় না গিয়ে পৃথিবীর কথা খুব সাধারণভাবে ভাবতে গেলে মনে হয় এ হল আমাদের ঘর, ভারী আপন আর চেনা। মহাকাশে পৃথিবীর অবস্থান ভাবলে প্রথমেই যে ছবিটা মনে ভেসে ওঠে তা হল অনন্ত অন্ধকার শূন্যে আপন গতিতে ঘুরে চলেছে নীল সবুজ এক গোলক। প্রাণের প্রকাশ যাকে গ্রহ পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন পৃথিবীর বুকে তরল জলের উপস্থিতিই সম্ভবত সেখানে প্রাণের বিকাশ সম্ভব করেছে। আর একটু সূর্যের কাছাকাছি হলে পৃথিবীর সব জল উবে যেত বাষ্প হয়ে। সূর্য থেকে আরও খানিকটা দূরে সরে গেলেই তার প্রতিটি জলবিন্দু হয়ে যেত বরফকঠিন। সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থান আমাদের পৃথিবীর। তাই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এই গ্রহ।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে, পৃথিবী ছিল বহুলাংশে জলময়। সেই জলে একফোঁটা জেলির মতো আবির্ভাব হল প্রথম প্রাণ। তারপর বিবর্তনের ধারায় একে একে এল গাছপালা, মাছ, সরীসৃপ আর উভচর সব প্রাণী। তারপর সবশেষে মানুষ। এল দুটি বিশেষ গুণ নিয়ে — ভালবাসার মতো হৃদয় আর চিন্তা করার মতো মন। নিজের আনন্দে সৃষ্টি করে চলল শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, স্থাপত্য। ক্রমশঃ তার সৃজনছন্দে মিলে গেল পৃথিবীর আবর্তনের ছন্দ। প্রাণ পেল তাই মানুষের সৃষ্টিও।

আমাদের এই মহাজাগতিক বাসস্থানটির সৌন্দর্যের উৎস হল প্রাণ। বন জঙ্গল দাপিয়ে বেড়ানো বাঘ, হাতী, হায়না, গভীর সমুদ্রের তিমি, সামুদ্রিক কচ্ছপ, গাছে গাছে ফুটে থাকা ফুল পৃথিবীকে শুধু ধুলো, বরফ আর অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সমষ্টিমাত্রতে পর্যবসিত হতে দেয় নি। আমাদের জীবন তাই প্রাণের উদ্‌যাপন। বেঁচে থাকাটাই উৎসব। বই পড়া, ছবি আঁকা, গান শোনা, বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে আড্ডা দেওয়া, খাওয়া দাওয়া, মেলায় যাওয়া, দোকানে দোকানে ঘুরে শখের বা প্রয়োজনের জিনিসপত্র কেনা এ সবই হল সেই উৎসবের অঙ্গ। নিজের নিজের ভাললাগা অনুযায়ী এর মধ্যে কেউ কোনটা বেশী করেন, কোনটা বা একটু কম করেন। কিন্তু এর কোন একটা জীবন থেকে একেবারে বাদ পড়ে গেলে বেঁচে থাকার রংটা যেন কিরকম ফিকে হয়ে যায়। তাই সব কিছু সামিল করেই আমাদের বাতায়নের এই বিশেষ সংখ্যা ‘প্রাণ ভরিয়ে’। চকোলেট খাওয়া থেকে শুরু করে বই মেলা, নেরুদার অনুবাদ থেকে কলকাতায় নান্দীকার অভিনীত ‘পাঞ্চজন্য’ নাটকের আলোচনা — নিশ্চয়ই আপনার ভাললাগার প্রসঙ্গটিও পেয়ে যাবেন এই সংখ্যায়।

রংএর প্রসঙ্গ উঠতে মনে পড়ে গেল মাত্র কিছুদিন আগেই ছিল দোলপূর্ণিমা। রঙে রঙে মেতে ওঠার দিন। আমি নিশ্চিত দোলের দিনটি আপনারা সকলে ‘অন্তরে বাহিরে’ রঙীন হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে এখন বসন্তকাল। বসন্ত ঋতু হল প্রকৃতির শীতঘুম ভেঙে জেগে ওঠার সময়, ‘প্রাণের হিল্লোলে’ ভরে ওঠার সময়। সেই বসন্তে যখন কোন প্রাণের স্পন্দন হঠাৎ চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়, বেদনায় ভরে ওঠে মন। গত ৭ই মার্চ আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেছেন শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সকলের প্রিয় ‘কালিকা দা’। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। রয়ে গেছে তাঁর কাজ। তাঁর কাজের মধ্যে বেঁচে থাকবেন তিনি। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। জন্মমৃত্যুর এই ছন্দের মধ্যেই অব্যাহত থাকে প্রাণের প্রবাহ। তাঁর ভাবনায়, কাজে যে ‘লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ’ এর প্রকাশ তা আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেবে।

আপনারা সকলে ভাল থাকবেন। সুস্থ থাকবেন। ২০১৭ আপানাদের আনন্দে, স্বাস্থ্যে, প্রাণশক্তিতে ভরে উঠুক এই আমাদের প্রার্থনা।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

Bangla Section

একদিন
আনন্দ সেন 1

বসন্ত
দেবাশীষ ব্যানার্জী 2

তুমি ও আমি
দেবাশীষ ব্যানার্জী 2

অভিমান
সুজয় দত্ত 3

কাজের লোক
শুভ্র দাস 4

লিমেরিক
শুভ্র দত্ত 5

যদি ভুলে যাও
আনন্দ সেন 6

যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন উত্তমকুমার
বিশ্বজিৎ মতিলাল 7

ছেলেবেলার কথা
বানী ভট্টাচার্য্য 9

অণুগল্প
ইন্দ্রানী দত্ত 11

স্ন্যাপসট – অন্ধকারের
শাশ্বতী বসু 13

মা
অনিতা মুখোপাধ্যায় 16

বর্ণপরিচয়
নন্দিনী ঋদ্ধানশ 19

অভিশপ্ত
পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ: সুজয় দত্ত) 25

বুঝিবে সে কিসে
শাশ্বতী ভট্টাচার্য 34

English Section

Vasanta
Souvik Dutta 39

The Proposal
Samrat Bose 41

A Glorious Defeat
Anjan Roy 44

Koenigsee
Jill Charles 49

If Our Hearts Travel
Jill Charles 50

A Journey With No Return
Mohan S. Kharbanda 51

Book Worlds
Carla Jankowski 55

Is This Bliss?
Kathy Powers 57

A Sacred Appearance
Bakul Banerjee 58

Panchajanya : A Drama Review
Balarka Banerjee 59

Santa's Fusion Fantasea : A Food Road Trip
Balarka Banerjee 61

একদিন

আনন্দ সেন, এ্যান আরবর, মিশিগান

আমি একদিন সীমানাগুলোকে পথের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে
হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে চলে যাব ।
পচাগলা শব গুলোকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে
নদীর পাড়ে গোলাপের চারা পুঁতব ।

আমি একদিন সব ধর্মকে খোলা বাজারে নীলামে তুলে
দেখব কার দর ঠিক কতখানি ।
আমি একদিন লাল আগুনের বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে
নীল আগুন বার করে আনব ।

আমি আমার ভয় আর সংশয়দের যত্নে
ভাঁজ করে বুকপকেটে রাখব ।
যাতে ফুসফুসের প্রত্যেক ওঠা পড়ার তাগিদে
ওরা আমার বেঁচে থাকায় মিশে থাকে ।

আমার হাতের মুঠোয় দুমড়ে আছে যে বিশ্বাস
তার পায়ের ধুলো ঝেড়ে
তাকে মাঠে নামিয়ে দেব
যাতে আড়াল হারিয়ে সে ভরা বর্ষায় ভিজতে পারে ।

আমি একদিন মুখের রঙ তুলে ফেলব
তৃতীয় অঙ্কের আগেই
সাদা আলোয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে গল্প বলব, রোদ্দুরের ।

একদিন আমি সারা রাত ধরে সম্পর্কগুলোর সাথে
মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করব
তারপর দেখব ভোরের আলোয় কে আমার পাশে শুয়ে আছে ।

আমি একদিন সব কিন্তু, যদি, আর তবুর গয়নাগুলো
পাহাড়ের মাথা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব ।
কাঁচঘরের পিছনে লুকিয়ে থাকা অকারণের সাথে
এক্কা দোক্কা খেলতে খেলতে মিলিয়ে যাব বনের মাধুর্যে ।

আমি একদিন এই সব করব ।
শুধু দরজাটা খুঁজে পেতে হবে ।

বসন্ত

দেবাশীষ ব্যানার্জী, এ্যান আরবর, মিশিগান

হয়তো তুমি কোনো এক বর্ষার ঢল
আমার কাঁচের নদী নির্বাক, অচল
বাঁধ ভেঙে এসো একা এই তীরে,
আহত আয়নার বুক চিরে
নৈঃশব্দ বেঁধে রেখো তবু, অবিচল

হয়তো তুমি বিয়োগের কোনো সুর
বিষন্ন বেহাগে বাঁধা ঠুনকো সমুদ্দুর
পোড়ামাটি কবে ভিজে গেছে জলে
দুচোখ তাই স্পষ্ট, তোমার আদলে
মুক্তো কুড়িয়ে রেখো কিছু, অগোচর

হয়তো তুমি নিশ্চুপ, অতীতের কোনো বাঁকে
আমার ছুট সরলরেখায়, দিগন্তের ডাকে
তবু বসন্ত স্থির, তোমাকেই ঘিরে
ছুঁয়ে আসি তাই ফিরে ফিরে
অস্ফুটে, নির্জন কোনো কক্ষপথে

তুমি ও আমি

দেবাশীষ ব্যানার্জী, এ্যান আরবর, মিশিগান

তুমি ও আমি,
আর আমাদের মতো
অজস্র বেনামী প্রতীক্ষার ভিড়ে
সহস্র বিছিন্ন দ্বীপের ক্ষত
আর নিশব্দ প্রতিধ্বনি
নিঃর্জন নদীতীরে

তুমি ও আমি,
বায়ু হয়ে ছুঁয়ে আসি
আয়ুরেখার দুই প্রান্ত
ক্লান্ত, অবশ্রান্ত পথে
সাথে করে নিয়ে আসি ফিরে
ইমন রাগে বাঁশি

তুমি ও আমি,
মেঘ হয়ে শুয়ে
সৌদামিনীর বিষাক্ত আঁচলে
বেলা শেষের পরে
বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি ধরে
অলক্ষ্যে, অজান্তে
নিশ্চুপ, রামধনুর দুই প্রান্তে

তুমি ও আমি,
আর আমাদের মতো
বাদামী পাতার নীড়ে
স্বপ্ন বয় কীট হয়ে
আঁকা বাঁকা নদী পথে
বিলীন বিষন্ন সমান্তরালে

তুমি ও আমি,
সহস্র যোজন দুরে
দুই দ্বীপের দুই মরুভূমি

অভিমান

সুজয় দত্ত

এখন কদিন থাকব তোমায় ভুলে,
খুঁজব না ঘেঁটে ট্যুইটার ফেস্‌বুক,
দেখব না আর ইন্‌স্টাগ্রাম খুলে
তোমার লেটেস্ট সেল্‌ফির হাসিমুখ ।

স্মার্টফোনে আর ল্যাপ্‌টপে ঝড় তুলে
করব না টেক্সট্ দু-মিনিট ছাড়া ছাড়া ।
চ্যাট্‌বক্স থাক কিছুদিন নিষ্ক্রিয়
স্কাইপে ডাকলে মোটেই দেবনা সাড়া ।

ল্যান্ডলাইনের পাট তো চুকেছে কবে,
কলার আইডি হয়েছে ডাইনোসর ।
সেল্‌ফোনে যায় ভয়েস্ মেসেজ রাখা —
রাখলেও চেক্ করি বহুদিন পর ।

অতএব তুমি চাইলেই পারবে না
আমার মনের গভীরে গহনে যেতে ।
পাস্‌ওয়ার্ডটাই করেছ যে হাতছাড়া —
ঘাম ছুটে যাবে আমার নাগাল পেতে ।

ভাবছ হঠাৎ কেন এ নিষ্ঠুরতা ?
কী এমন হল ? অপরাধ, নাকি ভুল ?
এদতো সেদিন উচ্ছ্বাসে উল্লাসে
ছিলাম দুজন একসাথে মশগুল ।

ছিলাম, কিন্তু কতদিন থাকা যায়
'জাস্ট ফ্রেন্ড'-এর তকমাটা গায়ে সেঁটে ?
'সিগ্‌নিফিকেন্ট আদার' হয়ে যে কবে
জীবনের পথে পাশাপাশি যাব হেঁটে —

সেই আশাতেই জেগে জেগে গেছে রাত,
ডেকেছি তোমায় আধো-ঘুমে জাগরণে,
স্বপ্নে দেখেছি বাড়িয়ে দিয়েছ হাত,
উষ্ণ করেছ চুম্বনে চুম্বনে ।

বাস্তবে যদি একটু সাহসী হতে —
এড়িয়ে না যেতে মুখোমুখি দেখা হলে —
কতবার লিখে পাঠিয়েছি এস্ এম্ এস্-এ
দোহাই, এবার সত্যিটা দাও বলে ।

বলতে পারোনি, আরো বেশী সংকোচে
বাড়িয়ে চলেছ মিথ্যের জটিলতা ।
নিরুপায় আমি, আড়ালে আড়ালে থেকে
লিখে গেছি চিঠি, হৃদয়ের জমা কথা ।

ভেবেছ সেসব কথা ছিল স্ন্যাপ্‌চ্যাট্ ?
পড়া হয়ে গেলে মুছে যায় সাথে সাথে ?
সিগ্‌নাল আমি দিয়ে গেছি অবিরত —
ধরতে পারোনি তোমার অ্যান্টেনাতে ।

নাও, এইবার তিল তিল করে বোঝো
অস্বীকারের যন্ত্রণা কাকে বলে ।
কোনোদিন যদি মর্যাদা দিতে পারো,
ঠিকানা রইল, ফিরব খবর পেলে ।

কাজের লোক

শুভ্র দাস, ক্যান্টন, মিশিগান

নানা ভাবে এরা এসেছে আমাদের জীবনে
কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অসহায়া,
কেউবা পিতৃ বিয়োগে,
সদ্য স্বামীহারা কেউ,
কেউবা স্বামী পরিত্যক্তা,
আবার দারিদ্রে অপারগ, নাচার পিতামাতার অনুরোধে কেউ ।

উৎসুক চোখে ওরা এসেছে
মাসান্তে কিছু টাকা,
আর দিনান্তে পেট ভরার আশায় ।
পরিবর্তে, যে ভালবাসা দিতে পারেনি একান্ত আপনদের
তাই তারা উজাড় করেছে পরের ছেলেমেয়েদের জন্যে

আমরা কখনো এদের ডেকেছি রুমা,
কখনো গৌরী, শ্যামলী, বুড়ি, পঞ্চমী, হিমানী, সবিতা, কাজল
কখনো বা শিখা, সাবিত্রী
প্রবাসী ছেলেমেয়েদের আশা ভরসা থেকে
এখন তাদের বাবামায়েদের কাছে
এরা হয়েছে অপরিহার্য

সকালের জলখাবারে,
সপ্তাহের রেশনে,
রান্নার বাসন পরিষ্কারে,
সময় মত বাতের ওষুধ এগিয়ে দেওয়ার,
হঠাৎ অসুস্থ হলে ডাক্তার ডাকায়,
আর সপ্তাহে একদিন টেলিফোন এলে
উৎসুক বাবা-মায়ের হাতে এগিয়ে দেওয়াতে,
সর্বত্রই রয়েছে এদের হাত

বছরে একবার ছেলেমেয়েরা আসে,
হই হুল্লোড় করে চলে যাবার সময়
মোটা বখশিস গুঁজে দেয় হাতে
বলে মা বাবাকে দেখিস, তারপর

তারপর, রোজকার কর্মময় একঘেয়েমির শেষে, টিভির পর্দার সামনে
নিজেদের স্বপ্নগুলোকে বিসর্জন দিতে দিতে
এরা হয়ত আগামী জন্মের স্বপ্ন দেখে — প্রবাসী হবার ।

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত, সিয়াটেল, ওয়াসিংটন

বুঝিয়ে দেখাই তোদের, কিভাবে সূর্যটা যায় অস্ত
অথবা কি করে ভাগ্যের ফেরে হয় সে রাহুগ্রস্ত
এই বলে দাদা তার দুআঙুলে
সৌখিন চীনেপ্লেট থেকে তুলে
মুখের ভিতর করল চালান রসগোল্লাটা মস্ত ।

***** ***** ***** *****

ভিড় করে তোরা দেখিস দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি
কত না বাহবা, পিছনের থেকে আমি শুনছি তো সবই
আমি যে পেরেক দেয়ালের পারে
ছবিটা আমিই রেখেছি তো ধরে
ভাবি, কবে তোরা আমার দিকেও একটু নজর দিবি ।

***** ***** ***** *****

তর্কের খাতিরেই এটা ধরা যাক তো
এক্সপিরেশন ডেট যদি লেখা থাকতো
বিষের শিশি লেবেলে;
সেই ডেট চলে গেলে
সে বিষ কি হত বেশী না কম বিষাক্ত?!

***** ***** ***** *****

কতই কেতায় বাজায় বাঁশি পাশের পাড়ার কানাই
সারে-গামা-পাধা-নি এই সাত স্বর তার জানাই
বানালো এক অদ্ভুত রাগ
পা ও ধা বর্জিত বেহাগ
নাম সে রাগের কি দেওয়া যায়? দিল 'ধানাইপানাই' ।

আকাশে উদিত বাঁকা রামধনু, অপূর্ব শোভা কি যে
সে ধনু তৈরী বৃষ্টিজলেই, ভুলে গেছিলাম নিজে
হায় হরি, শেষে একটু বাদেই
সে মেঘ মাথার ওপর এলো যেই
সাথে নেই ছাতা, অবস্থা যা তা, পুরোই গেলাম ভিজে ।

***** ***** ***** *****

যখনই জল আর ভোদ্‌কা মিশিয়ে গ্লাস থেকে ঢালি গলে
একটু বাদেই মাথা ল্যাগ্‌ব্যাগ পা-টা ঝিম্‌ঝিম্‌ টলে ।
জল-ও-রাম, সবই দেখি একই ফল ।
তাই ভাবি কিছু গড়বড় আছে নির্ঘাত ওই জলে ।

***** ***** ***** *****

চাঁদটাকে টানে পৃথিবী, চন্দ্র তাকে ঘিরে ঘোরে সে টানে
পৃথিবী তো ঘোরে সূর্যকে, সূর্য কাকে ঘিরে ঘোরে কে জানে
ঘোরায় ঘোরায় ঘোর লেগে যায়
ঘোর ঘনঘোর গোলোক ধাঁধায়
সে ঘোরার ঘোরে শুধু মাথা ঘোরে ব্রহ্মাণ্ডের-এ জ্ঞানে ।

***** ***** ***** *****

রংটা চাপা ? দরদীজন এই উপদেশ বিলায় তারে
ম্যাজিক ক্রীমের জাদুই শুধু ওর সমাধান করতে পারে
হায়রে আমার দরদীজন
কোন জাদু মন করবে শোধন
না পালটালে দৃষ্টি তোমার মনের কালো ঘুচবে না রে ।

শুভ্র দত্ত সিয়াটেলের বাসিন্দা, পেশায় রোবটিক্স প্রযুক্তিবিদ, আর নেশায় লিমেরিকবি, অর্থাৎ লিমেরিক লেখেন এমন কবি ।

তার চেয়ে একটু বিশদে বলতে গেলে – শুভ্র দত্ত আদতে কলকাতার ছেলে, পরে সিয়াটেল শহরের প্রায় তিন-দশকের বাসিন্দা । নানা সময়ে নানারকম পেশায় পা গলিয়েছেন – মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্যামেরার ব্যবসা, বায়োমেডিকাল প্রযুক্তি, রোবটিক্স, ইত্যাদি প্রভৃতি । নেশাও নানান ধরণের; তার মধ্যে আছে ছবি তোলা, বাংলা বই পড়া, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, ওয়েবসাইট বানানো, এবং অনর্থক অর্থহীন লিমেরিক লেখা । বাংলিমেরিক ডট কম (BangLimeric.com) ওয়েবসাইট ওনারই সৃষ্টি ।

বিশ্ব সাহিত্যের অনুবাদ

যদি ভুলে যাও

আনন্দ সেন, এ্যান আরবর, মিশিগান

তোমাকে কিছু কথা দিতে চাই বলে
হয়তো তোমার জানা এসব
হয়তো করেছ অনুভব
যখন আকাশ মাটিতে নামে পড়ন্ত বিকেলে

আমি দেখি
কাঁচঘরে মোড়া চাঁদ
পৃথিবীর বুকে আলো জ্বালে
অলস হেমন্তের রঙ
উঁকি মারে
জানলায় ঝুঁকে থাকা ডালে

আমি ছুঁয়ে ফেলি
আগুনের পায়ে শুয়ে থাকা ছাই
কুঞ্চিত পোড়াকাঠে লেগে থাকা
কালকের আশনাই

এসব আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যায়
যেন এ সব অস্তিত্ব, এ শব্দ, গন্ধ, আলো,
এ ধাতব স্পর্শগুলো

এরা সব তরী বায়
তোমার ও দ্বীপের সন্ধানে
যে দ্বীপ আমার প্রতীক্ষায়
সারারাত মুহূর্তদের গোনে ।

কিন্তু,
হঠাৎ, তোমার ভালবাসা যদি
হয় বয়ে যাওয়া নদী
দূরে যায় সরে
এক পা এক পা করে

তখন
আমার ভালবাসা অভিমানী
পিছু হেঁটে সেও যাবে জানি
চৌকাঠের ওপারে ।

যদি হঠাৎ ভোলো আমায়
চেয়ো না পিছন ফিরে আর
জেনো আমিও নিজের মত
ভুলেছি ভোলার ক্ষত
ভুলেছি যা ছিল তোমার আমার ।

যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ো
হারাও আমায়
উন্মত্ত অন্তহীন মিছিলের ভিড়ে
যদি খুলে নাও মুঠি
ফেলে আসো আমায় হৃদয়ের তীরে
যে হৃদয়ে পুঁতেছি শিকড়

তবে জেনে রেখো ঠিক
সেই দিনে, সেই ক্ষণে
আমিও নোঙর তুলে
বাতাসের সাথে মিলে
চলে যাব অন্য অন্তরীপ
অন্য জমিতে আমি ফেলব আঁকড় ।

কিন্তু যদি প্রতিদিন, প্রতি পলে
থাকো এ বিশ্বাসে
আমারই নিশ্বাস তোমার বারোমাসে ।
যদি প্রতিদিন তোমার ওষ্ঠবাহী গোলাপ
খোঁজে আমার মুখ
খোঁজে ভালোবাসা, আমার গভীর সুখ ।
তবে জেনো
সে আগুন নেভেনি এখনও ।

প্রিয়তমা,
আমার ভালবাসা যদি থাকে মিশে
তোমার ভালবাসার আশে পাশে
ভুলে যাবে সে সকল ক্ষরণ
আমার আমিকে নিয়ে
তোমার বাহুলগ্ন হয়ে
কাটাবে সে আনখ জীবন ।

পাবলো নেরুদার জন্ম হয় চিলির ছোট্ট গ্রাম প্যারালে ১৯০৪ সালের ১২ই জুলাই । আন্তর্জাতিক খ্যাতিস্পন্ন এই কবিকে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া হয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার । ১৯৭৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের সমাপ্তি ঘটে । "Poetry is song and fertility" — তাঁর বহু কবিতায় তাঁর নিজের এই দর্শনের প্রকাশ । উপরের কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত "love poems" এর একটির অনুবাদ। মূল কবিতাটি হল "If You Forget Me".

স্মৃতিচারণ

যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন উত্তমকুমার

বিশ্বজিৎ মতিলাল, কলকাতা

কলকাতার ভবানীপুরের ‘গিরিশভবন’ । গিরিশ মুখার্জি রোডের এই বিশাল বাড়ি অভিজাত মুখার্জি পরিবারেরই ভদ্রাসন । সেই বাড়িতেই ‘লুনার ক্লাব’ । মুখার্জি পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে দু’-তিন বাড়ি পরের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ছেলেদের ওঠাবসা । মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে আমিও আত্মীয়তার পাশে আবদ্ধ । বালক বয়স তখন, স্নেহময়ী ঠাকুমার নিত্যসঙ্গী আমি । একদিন বললেন ‘কাল গিরিশভবনে যাওয়া হবে, জগদ্ধাত্রী পুজোর আমন্ত্রণে । কিন্তু যাওয়া হবে সন্ধ্যায় ।’ ওইদিন পূজার অঙ্গ হিসাবেই বাড়ির সবাইয়ের নিশি জাগরণ । সারা রাত ধরে অভিনীত হবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত ‘নরনারায়ণ’, যাত্রাপালার আঙ্গিকে । ঠাকুরমা বললেন ‘কৃষ্ণের ভূমিকায় কে অভিনয় করবে জানিস, উত্তমকুমার’ ।

আমার সেই বালক বয়সে উত্তমকুমারের চাইতেও বেশি টান ছিল পুজো বাড়ির লুচি পায়েসের প্রতি । হাজির হলাম ‘গিরিশভবন’-এ পিসির বাড়িতে । দেখলাম দেবী প্রতিমার সামনে বিশাল উঠোনের মাঝে যাত্রার আসর পাতা হয়েছে । আমাদের দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল, সেখান থেকে যাত্রার আসর ভালো ভাবেই দেখা যায় । তিনটি চেয়ার পাতা, মাঝেরটিতে আমি, একপাশে ঠাকুমা আর একপাশে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা, যিনি আমার অচেনা । দুই মহিলা গল্প করতে লাগলেন, আমি অপেক্ষায় আছি কখন প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়বে । এল সেই আকাঙ্খিত মুহূর্ত । পেট ভরে লুচিতরকারি, পায়েস খেয়ে বালক আমি সেই ঘরেরই খাটে ঘুমিয়ে পড়লাম ।

কতক্ষণ পরে মনে নেই ঠাকুমার ডাকে ঘুম ভাঙল । ‘তাড়াতাড়ি আয় এইবার উত্তমকুমার আসবেন ।’ গিয়ে বসলাম আবার দুই মহিলার মাঝে । পুরোদমে চলছে যাত্রা । একটু পরেই এলেন তিনি । খালি গায়ে, পরণে হলুদবর্ণ ধুতি । হাতে বাঁশি, মুখে মন ভোলানো হাসি । আসরে প্রবেশ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের । সেই আমার প্রথম উত্তম দর্শন । কিছু পরে ঠাকুমাকে বলতে শুনি পাশের মহিলাকে ‘আপনার ছেলে সত্যিই কৃষ্ণ ।’ বুঝলাম সেই মহিলা উত্তম জননী । স্মৃতিপটে এই ছবিটি যেমন আঁকা হয়ে আছে, তেমনই মনে পড়ে যায়, আমার বৃদ্ধা পিতামহীর উত্তম আগ্রহের কথা ।

এরও অনেক পরে, আর এক আত্মীয়ের বাড়িতে মাকে নিয়ে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়ে সামনাসামনি দেখি উত্তমকুমারকে । আজও মনে আছে আমার মা উত্তমকুমারকে বলেছিলেন ‘বিচারক’ ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় কতটা ভালো লেগেছিল । মহানায়ক বোধহয় উত্তরটি আশা করেননি, তবে স্পষ্টতই খুশি হয়েছিলেন । আমার কিন্তু আজও মনে আছে উত্তম দর্শনে আমার মায়ের আগ্রহ । পরেও তিনি সেই স্মৃতিটি সযত্নে লালন করতেন ।

এরপরে, আমার সমবয়সীনিদের মধ্যে দেখেছি, প্রায় একই রকমের কৌতুহল ও উদ্দীপনা, যার কেন্দ্রে উত্তমকুমার । অবাক হয়ে ভাবি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে, কোন মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন এই মানুষটি ।

মধ্যবিত্ত মননে তাঁর আবেদন চিরকালীন, আজও অম্লান । ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’-এর রাইচরণ থেকে ‘নিশিপদ্ম’-এর অনঙ্গ দত্ত । সব ধরনের চরিত্রেই পেয়েছি আমরা এক চিরকালীন নায়ককেই ।

আমাদের গণমাধ্যমগুলির উত্তমপ্রীতি, চোখে পড়ার মতো। তাঁর জন্মের ও মৃত্যুর মাস দুটিতে পত্রিকাগুলি বার করে বিশেষ সংখ্যা, সংবাদপত্রগুলি ছাপে বিশেষ প্রবন্ধ বা সাক্ষাৎকার, সঙ্গে থাকে চিত্রসম্ভার। প্রকাশনগুলি জানে, আজও পাঠকপাঠিকাদের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন পাতা রয়েছে 'নায়ক'-এর অরিন্দমের বা 'সপ্তপদী'-র কৃষ্ণেন্দুর।

আক্ষেপের বিষয় একটাই। বাঙালির কাছে, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে, উত্তমকুমারের এই সার্বজনীন আবেদনের কারণটি কী ? এই বিষয়ে কোনও গবেষণাঋদ্ধ রচনা পাওয়া যায় না। সাংবাদিকদের যতটা আগ্রহ তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রতি, তাঁর অভিনয় বিশ্লেষণ বা চরিত্রায়নের দক্ষতা বা অভিনয় ব্যঞ্জনার মূল্যায়নে প্রায় ততটাই অনীহা। ভেবে দেখার সময় এসেছে যে, উত্তমকুমারকে নিয়ে, তাঁর অভিনয় শৈলীকে নিয়ে গবেষণার বড়ই প্রয়োজন।

(লেখকের পরবর্তী বয়সে চলচ্চিত্র ভাষার অধ্যায়ণ ও চলচ্চিত্র চর্চা তাঁর সময় ও মন জুড়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের তিনি আমন্ত্রিত বক্তা। এছাড়া সিনেমা নিয়ে লেখাপড়া তাঁর প্রিয় কালক্ষেপ। তাঁর অন্যতম প্রিয় পুরুষ অভিনেতা উত্তমকুমার। ছোটো থেকেই তিনি বিশেষ ভাবে উত্তম সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত। তাঁর বাল্যকালের অক্ষয় স্মৃতি যাত্রায় উত্তমকুমারের অভিনয় দর্শন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি উত্তমকুমারের কাজকর্মের কাছাকাছি হতে পেরেছিলেন। 'নায়ক' ছবির সেটে উত্তমকুমারের অভিনয় দেখা আরও এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।)

বিশ্বজিৎ মতিলাল — সাংবাদিকতা, গণজ্ঞাপন, জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপন শিল্পের দুনিয়ায় একটি অতি পরিচিত নাম। তিনদশক সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা এবং দুইদশকেরও বেশী জনসংযোগের কাজে জড়িয়ে। শিক্ষকতা এবং ছাত্রদের সাথে নানাভাবে নিজেকে যুক্ত রাখার আনন্দ তাঁর দক্ষিণের বারান্দা, টাট্‌কা হাওয়ার সুঘ্রাণ।

স্মৃতিচারণ

ছেলেবেলার কথা

বানী ভট্টাচার্য্য, শিকাগো, ইলিনয়

এখনো আমার মনে পড়ে আমার বাবার সেই কালো মুখটা আর চোখ ভরা জল। পশ্চিমের নীল আকাশে বহুদুরে ঘোলা সূর্য্য প্রায় ডুবুডুবু। সারাদিন পরে গরমের উত্তাপে অর্ধদগ্ধ হয়ে একটা পাতলা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বাবা বোধহয় বসেছিলেন বারান্দাতে, একটুখানি হাওয়াতে গা টা জুড়োতে। আমাকে দেখেই বাবা চোখের জলবিন্দুগুলো ডানহাতে করে মুছে নিলেন যতদূর সম্ভব আমাকে এড়িয়ে। সময়টা হচ্ছে উনিশসো ষাট সাল নাগাদ। আমি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি সবে। আমার দিদি কলেজে উচ্চশিক্ষায় রত। আমার পরের বোনও কলেজে যেতে আরম্ভ করেছে। আর আমার অনেক পরের বোন খুবই ভালো করছে হাইস্কুলে। আমাদের ভাই নেই। আমার বাবা ছোটবেলা থেকেই কাজ করে, অনেক কষ্ট করে, নিজের রোজগারে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, বোনের বিয়ে দিয়ে, তারও বারটা ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, অত্যন্ত সৎভাবে জীবনযাপন করে সুন্দরভাবে সংসার চালাতেন। বারোটা সন্তানের জন্ম দিয়ে আমার পিশেমশাই টি বি তে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়েসেই এ পৃথিবী থেকে চলে যান। আমার বাবার জীবন ছিল অত্যন্ত সৎ আর গভীর মায়াতে পূর্ণ। তাঁর একটাই লোভ, তা হলো শিক্ষার প্রতি। আমার বাবা মেধাবী ছাত্র হলেও বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি বাড়ীর প্রয়োজনে। তাই বোধহয় আমাদের ছোটোবেলায় একদিন আমাদের বোনেদের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমাদের সবচেয়ে বড় উপহার যেটা আমি দিতে পারি সেটাই তোমাদের দোবো। সেটা হচ্ছে শিক্ষা।' মনে মনে আমার বাবার আশা ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হলে ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। দরকার হলেও ওদের কারুর ওপর নির্ভর করতে হবে না। এটাই আমাদের বাড়ীর কাহিনী।

এবার চলে আসা যাক সেদিনের কথায় যেদিন এসেছিল আমার বাবার চোখে জল। আমার সাত মাসী, আমার মা ছিলেন সেজো। মাসীদের সবাইয়ের খুব বড়ো লোকের বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল। হয়তো তাঁরা খুব সুন্দর দেখতে আর ফর্সা ছিলেন বলে। আমার মাও খুব ফর্সা আর সুন্দর দেখতে তবে খুব ছোটোখাটো ছিলেন। সময় পেলেই আমার মাসীরা অনেকে মিলে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হতেন আর খাওয়াদাওয়া করে, অন্য লোকেদের সম্বন্ধে আলোচনা করে, বিকেলে বিদায় নিতেন। আমাদের মোটর গাড়ি ছিল না, এদিকে আমার খুব মোটর গাড়ি দেখার আর চড়বার শখ। সে রবিবার দিনটায় সারাদিন সকাল থেকে বারান্ডাতে চলাফেরা করছি, বাড়ির সামনে অনেকগুলো মোটর গাড়ি এসে উপস্থিত হবে বলে। অবশেষে একটা ছোটো মতন মোটর গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। আমি দেখতে লাগলাম একজনের পর একজন মাসিমা নামছেন তাদের সব ছেলেমেয়ে নিয়ে। অবশেষে সব মিলিয়ে তেরজন নামলেন সেই মোটর গাড়ি থেকে। সবচেয়ে বড়লোক মাসিমা বললেন আমাদের, 'গল্প করতে করতে সবাই একসঙ্গে আসার মধ্যে মহা আনন্দ।' আমার দিদি পরে আমার কানে কানে বলে ছিলো, 'পেট্রলের দাম বাঁচাচ্ছেন ওরা।' তারপর খাওয়া দাওয়া করে, হাজার রকমের মতামত দিয়ে বিদায় নিলেন তাঁরা গাড়িতে ঠেসাঠেসি করে বসে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আমার সে রবিবারদিনটা মহা আনন্দে কেটে গেল আমাদের মাসিমাদের গুঞ্জনে, বিশেষ করে আমার বড়লোক মাসিমারা যাবার সময় সকলে মিলে আমার হাতে কয়েকটা খুচরো পয়সাও দিয়ে গিয়েছিলেন, যখন আমার মা সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন রান্নাঘরে, বড়লোক বোনেদের আপ্যায়ন করে খাওয়াতে।

সন্ধ্যে হতে চলেছে সেদিন। প্রতিদিনের মত আমার ঠাকুমার আদেশে আমার কাজ ছিল, বাড়ীর সবাইকে একসঙ্গে করে দালানের তুলসী গাছের কাছে এনে সন্ধ্যের শাখ বাজানো আর ঠাকুরকে হাত জুড়ে মন ভরে ডাকা — যখন আমার বাবা আর ঠাকুমা মন্ত্র আওড়াবার ভার নিতেন। তাই আমি গিয়েছিলাম বাবাকে ডাকতে আর সবাইকে সম্মিলিত করতে সন্ধ্যের পুজোর জন্যে।

বাবাকে খুঁজতে এসে দেখলাম, আমার কঠোর কিন্তু দয়ালু, শান্ত, ভদ্র, স্বল্পভাষী বাবার চোখে জল। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা তুমি কাঁদছো ?' আমার সত্যবাদী বাবা তাড়াতাড়ি করে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'চল মা, সন্ধ্যের শাঁখ বাজাতে চল্।' আমি বাবাকে ভীষণ ভালবাসতাম, হয়তো আমার মায়ের থেকেও। আমিও ছাড়বো না। 'বাবা তোমাকে বলতেই হবে আজকে এত আনন্দের মাঝে তোমার মন খারাপ কেন ? আমি বাড়ীর কাউকে বলবো না।' বাবা জানেন, আমি খুব একগুঁয়ে মেয়ে। আমি সহজে ছাড়বার পাত্র নই। উত্তর না পেলে আমি হয়তো আগ্রহের চোটে বাবার এই দুর্বল মুহূর্ত্তের কথা বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞেস করে বেড়াবো। তাই আমার বুদ্ধিমান বাবা বললেন, 'জানো তোমার মেজমাসী আমাকে বলে গেলেন, আমার মত অবস্থার লোক মেয়েদের এত শিক্ষিত করেছি, ওদের জন্যে উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেলেও, তাদের ডাউরী দেবার ক্ষমতা আমার কোথায় ? কাজটা আমি ভালো করছি না, তোমাদের চারজনকে এত শিক্ষিত করে। সত্যিই তো আমি রোজ আনি রোজ খাই। বাকী টাকা কটা তোমাদের স্কুল বইখাতার খরচেই তো উড়ে যায়। আমার জমানো টাকা কোথায় ? তোমাদের সমান সমান পাত্র পেলেও তারা তো অনেক টাকা চাইবে। বোধহয় আমি কাজটা ভালো করছি না। তোমার মাসিমা ঠিকই বলেছেন। তবে মনে একটু লেগেছে, ঠিক কথা হলেও।' তখন আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল, বাবার মনে কষ্ট লাগার জন্যে, আর আমাদেরই জন্যে। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাবা তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমরা বিয়ে করবো না। চলো তুমি সন্ধ্যের পুজো দিতে। দেখো ভগবান সব ঠিক করে দেবেন।'

বাবার হাত ধরে সেদিন আমি উঠোনে নিয়ে এসেছিলাম বাবাকে। না একথা আমি আর কাউকে কখনও বলিনি। আমার এ কথাও মনে আছে ঠাকুরকে বলা, সব কিছু ঠিক করে দিতে।

আজ আর আমার বাবা নেই। সেই সন্ধ্যে এখনও আমার চোখে ভাসে। সূর্য্য যখন বিদায় নিচ্ছেন, আমার বাবার দুচোখের কোণে দুবিন্দু জল আমাদেরই ভাবনাতে। সেদিন থেকে আজ অনেক বছর পরে মনে হয়, সত্যিই ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। হয়তো সেদিন সন্ধ্যেতে ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা ভগবান শুনেছিলেন। তাই বোধহয় আমার দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এক বিলেত ফেরত খুব ফর্সা সুন্দর দেখতে নামকরা ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি নিজে এসে দিদিকে দেখা মাত্রই সেইদিনেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিছু না নিয়েই। বাবার অনুরোধে একসপ্তাহ অপেক্ষা করেছিলেন। আমার বিয়েতেও আমার বাবাকে কোনো পয়সা খরচ করতে হয়নি, কারণ আমার বিয়ে যাকে বলে এদেশের ভাষায় 'ইলোপ'। বিয়ে হয়েছিল এদেশে পাঁচ ডলারে আর সেটা আমার স্বামীই দিয়েছিলেন। আমার পরের বোনকে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর এতই ভালোলেগে গিয়েছিল যে তিনি তাঁর বাবাকে পটিয়ে বিনা যৌতুকে বিয়ে করেছিল আমার পরের বোনকে। আমার ছোটো বোনের বরের বাবাও কিছু চাননি যদিও বর ছিলেন আমার বাবারই পছন্দ করা জামাই। যেহেতু আমি যেতে পারিনি সে বিয়েতে, তাই আমিই পাঠিয়েছিলুম কিছুটা বিয়ের খরচ।

কে বলতে পারে কার ভাগ্যে কি আছে ? কিন্তু বাবার দেওয়া আমাদের শিক্ষার ফলের জন্যেই আমরা আজও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। সত্যিই বাবা আমাদের শিক্ষিত করে, আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে গেছেন। আজ আমি ভাবি আমার বাবার মত বাবা পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমার মাসীমারা বাবাকে হয়তো ভালো উপদেশই দিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান বোধহয় তখন ওপর থেকে হেসেছিলেন।

অণুগল্প

ইন্দ্রানী দত্ত, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

অণুগল্প - ১

— 'এই লীলা, কাল ফোন করলি না তো । রাতের দিকে একটা এস এম এস করলাম তোকে । পেন্ডিং দেখালো । মোবাইল অফ করে রেখেছিলি না কি ?'

— 'হুঁ । শুয়ে পড়েছিলাম আধখানা ভ্যালিয়াম খেয়ে ।'

— 'মাথা ধরেছিল ?'

— 'সে তো আছেই । নিত্য সঙ্গী । আসলে কাল ও এমন অসভ্যতা করছিল — অসভ্যতাই আর কি বলব —'

— 'কেন কি হয়েছে ?'

— 'কিছুই না । কোনো ইস্যুই নয় । কোথায় কোন লকে চাবি লাগছে না, কোথায় কোন ক্যাবিনেটের হ্যান্ডেল খসে পড়ে গেছে, আমি ভুলে রাখি নি তাই হারিয়ে গেছে — এই সব ফালতু ব্যাপার নিয়ে এমন বিশ্রী ভাবে বলল যে তুই ভাবতে পারবি না ।'

— 'সে তো আমাকেও, রোজই কিছু না কিছু, আর সবই নন ইস্যু । ইচ্ছে করে সংসারের মুখে ইয়ে দিয়ে চলে যাই । এই লোক গুলো যে কি । পুরুষ বিশেষ করে বাঙালী পুরুষ মানেই এই । সব বাড়িতেই তো এক প্রবলেম শুনি । সত্যি দেখবি একদিন চলে যাব সব ছেড়ে ।'

— 'কাল বলে কি না — কি কর সারাদিন বাড়িতে, কিছু খেয়াল রাখতে পারো না ? আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বলল । আঙুল তুললে এমনিতেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যায় তার ওপর এই বয়সে এখন যদি কি করি করেছি শুনতে হয় — রাগে মাথা ঝনঝন করছিল, ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম । সেদিন বলল গেট আউট কি না এক কথা তিনবার বলেছি । তুই ভাবতে পারিস শম্পা ? নিজের ওপরই রাগ হয় কেন পড়ে আছি এখানে । আর তুই বলিস শংকরের মেজাজ এর কথা । রূপকের আসল চেহারা যদি দেখতি । রেগে গেলে যা মনে হয় তাই বলে । ভাবতে পারবি না ।'

— 'আরে গেট আউট মানে কি গেট আউট । আমাকে তো চুলের মুঠি ধরে চড়ও মেরেছিল শংকর ।'

— 'কি বলিস মেরেছিল তোকে ?'

— হ্যাঁ, আমিও মুচড়ে দিয়েছিলাম হাত । ৬ মাস বাড়ি ছেড়ে, পুপুনের কাছে ছিলাম ।'

— 'থাক থাক ওসব কথা । আর ভাবিস না । পরশু আসছিল তো রূপাই-এর জন্মদিনে ? এখন রাখলাম । বেরোবো । রাতে কথা হবে ।'

শম্পা চিরকাল সেই রকম রয়ে গেল — কেমন একটা লো ক্লাস — মারামারি করে, আবার সে সব কথা হড়হড় করে বলে দেয় — ভাবতেই শিরশির করে আলতো একটা আনন্দ হ'ল লীলার । রূপকের নম্বর টিপল — 'শুনছ ? ব্যস্ত নাকি ?'

অণুগল্প - ২

সুমির মা বাবা দুজনেরই খুব ভয় । মেয়ে বড় হতে থাকলে মা বাবার যেমন হয় আর কি । মেয়েকে ঘিরে তারা সুরক্ষাবলয় গড়ে তুলেছে দুজনে মিলে ।

এই সময় মানে ভোরের দিকেই সুমি টিউশনে যায় শ্যামলীদির কাছে — ফিরে এসে স্কুল। কোনো পুরুষ শিক্ষকের কাছে কোনদিন প্রাইভেট পড়বে না সুমি — যা সব ঘটনা চারদিকে। উফ। সুমিকে বুক দিয়ে আগলে রাখবে ওরা — সুমির মা বাবা। সুমির হাত ধরে শ্যামলীদির বাড়ির পথটুকু পেরোয় প্রফুল্ল। মোটের ওপর নিরুপদ্রবেই। সাধারণত: এই সময় গান গাইতে গাইতে সাইকেলের চেনে তেল লাগায় গোপাল, সুমিকে দেখলেই গানের গলা চড়তে থাকে — প্রফুল্লর তো তাই মনে হয়। লালার দোকানের ফোঁটাকাটা অল্পবয়সী কর্মচারী দোকানের তালা খোলে, জুলজুল করে সুমিকে দেখে। গামছা পরা লোকটা কলতলায় সাবান ঘষে ঘষে স্নান করে। টেনশন হয় প্রফুল্লর। আজ শীতটা বেশি পড়ায় পথঘাট শুনশান। হাল্কা কুয়াশা। খুশি খুশি লাগে কেমন। শ্যামলীদির বাড়িতে সুমিকে পৌঁছে বাজারে যায় সে, বাজার সেরে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। স্কুলে নিয়ে যাবে গীতা, সুমির মা, সুমির স্কুলেই পড়ায়, একই সঙ্গে বাড়ি ফিরবে মা, মেয়ে। এভাবেই তৈরী হয়েছে সুমিকে ঘিরে তাদের সুরক্ষা বলয়।

শ্যামলীদি রিটায়ার্ড টীচার। আজ সকালে উঠতে দেরি হয়েছে। এখনও বাথরুমেই। তাঁর ছেলের বৌ সুমিকে বসতে বলে রান্নাঘরে যায়। শ্যামলীদির পড়ানোর ঘরে চেয়ার টেবিল, পেন পেন্সিল রুলার, চার দেওয়ালে গম্ভীর মুখে মনীষীরা। সুরক্ষিত সুমি বসে বসে টেস্টপেপারের পাতা উল্টোয়। ঘুম থেকে উঠে আসে শ্যামলীদির চার বছরের নাতি। উস্কো চুল, লাল সোয়েটার — চকলেট আনলে হত ওর জন্য। আচ্ছা পরের সপ্তাহেই আনবে না হয় — শনিবার ক্রিসমাস। বাবাকে বলে একটা ফ্রুট কেক কিনে আনবে শ্যামলীদি আর নাতির জন্য। বাচ্চাটা টলটল পায়ে এসে দাঁড়ায় তার পাশে। বেবি পাউডার-এর গন্ধ পার সুমি। লাল সোয়েটার তার ছোটো ছোটো হাত সুমির বুকে দেয় সটান — 'এখানে দুদু। দুদু খাবো।'

অণুগল্প - ৩

— বৌমা সুখী কে ?

উফ এই শুরু হ'ল বুড়োর দর্শন কপচানো। প্রতিদিন এই এক। খেতে বসে যত পুরাণ ধর্ম দর্শনের কথা। ঠক করে ভাতের থালা নামিয়ে রাখে সুপ্তি। তারপর বাবা শব্দটা আগে গিলে নিয়ে ভাঙা গলায় বলে, 'আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে ঐ শব্দটা আমার অভিধানে নেই।' তারপর মনে মনে চূড়ান্ত গালাগালি দেয়। জোরে জোরে বললেও বুড়ো শুনতে পাবে না। কানের যন্ত্রটা খুলে খেতে বসেছে। লেবু চিপছে ডালে, ভাত মাখছে।

সুপ্তি বিজবিজ করে বলতে থাকে — আমার মত মেয়ে বলে এখনও আছে, নইলে কবে চলে যেত সংসারের মাথায় ঝাঁটা মেরে। নোংরা জঘন্য শয়তান একটা। কেন যে আছি ওর সঙ্গে এখনও — নিজের ওপরই ঘেন্না হয়।'

সুপ্তির শ্বশুর ফোকলা দাঁতে হাসে। কনিষ্ঠা, অনামিকা আলতো চাটে। আবার হাসে।

— 'কুলের অম্বলের এমন চমৎকার স্বাদ হয়েছে আজ। ঠিক আমার মার মত। কি যেন বলছিলে বৌমা ? হারামজাদা আবার ঝামেলা শুরু করেছে ?'

সুপ্তি চোখ তুলল। শ্বশুরের তোবড়ানো গালে, পিঠে কাঁধে শীতের রোদ। কাঁসার থালায় অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন। লেবু নুন। মসৃণ লাল মেঝেয় দু ফোঁটা জল, একটা কালো পিঁপড়ে ঘুর ঘুর করছে।

সুপ্তি মুখ নামালো — আঙুল দিয়ে জলের রেখা আঁকল পিঁপড়েকে ঘিরে। দুপুরের রোদটুকু মিলিয়ে যাচ্ছিল। সুপ্তি বলল — 'না বাবা, ভালই আছি।'

সিডনির বাসিন্দা ইন্দ্রাণী দত্ত পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্পো লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

গল্প

স্ন্যাপসট – অন্ধকারের

শাশ্বতী বসু, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

টুং টাং, টুং টাং জলতরঙ্গের সুরে ইন্টারকম্‌টা বেজে ওঠে হঠাৎ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ানো নৈরঞ্জনা তখন তার ডান গালে একটা কুচকুচে কালো নকল আঁচিল চেপে চেপে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। ইন্টারকমের আওয়াজ শুনে ছুটে এসে রিসিভারটা তুলে নেয় সে।

– মেম্‌সাব ডেরাইভার সাব্ আগেয়া বাহার মে – গেটে বাহাদুরের গলা শোনা যায়।

– বলো, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি – বলে নৈরঞ্জনা।

ইন্টারকম্‌টা নামিয়ে ফিরে আসে আবার সে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। গলায় গুন্‌গুনিয়ে উঠছে খুশীর গানের সুর। তিনটে ফোল্ডিং পীসের বিরাট আয়নায় ধরা পড়ে বিচিত্রবেশী নৈরঞ্জনার প্রতিকৃতি। মাথায় উস্কোখুস্কো খাটো চুলের উইগ্ – পরনে সাদা কাপড়ের থান, সাওঁতালী ধরনের ঘুরিয়ে পড়া – হাতে রুপোর মোটা রুলী, গলায় কামরাঙ্গা বীজের কণ্ঠী – চেনাই যাচ্ছে না রূপসী আধুনিকা নৈরঞ্জনা মুখার্জীকে। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে উড়িষ্যার এক প্রত্যন্ত গ্রাম কালাহান্ডির দরিদ্র উপজাতি রমণী পার্বতী কিস্‌কু। সিওর সট্। বিদ্‌ঘুটে আঁচিলটাকে গাল থেকে নামিয়ে একটা পাত্‌লা প্লাস্টিকে মুড়ে গাড়ীর উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় নৈরঞ্জনা। কিন্তু মনে মনে একটু দুশ্চিন্তা রয়েছে সুনীপার জন্য। ওতো এখনও এলো না।

নীচে পা রাখতেই চোখে পড়ে গেট দিয়ে ঢুকছে সুনীপা।

– তুমি চিন্তা করো না নৈনা। পার্বতীর পুরো ভারই আজ আমার ওপর। তুমি ঠিকঠাক পারফর্ম করো। আমার আজ এখানে থেকে গেলেও চলবে। গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে বলে সুনীপা।

– বাঁচালে ভাই। নৈরঞ্জনা হেসে গাড়ীর দিকে এগোয়। খেয়ে নিও কিন্তু সুনীপা। ফিরতে দেরী হবে আমার। গাড়ীতে উঠে বসতেই ড্রাইভার ঝট্‌তে গাড়ী স্টার্ট দেয়।

- -

ছোট্ট বিদেশী লাল গাড়ীটি ছোটে ইষ্টার্ণ বাইপাস ধরে। লক্ষ্য কইখালি গ্রামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থা ‘ভলান্টাস্’ এর অপারেটিং সাইট।

হু হু করে জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। নৈরঞ্জনা আরাম করে পেছনে হেলান দিয়ে বসে। অবশ্য আরাম শব্দটা তার অভিধান থেকে সে ইচ্ছে করেই মুছে দিয়েছে। কোটিপতি বিজনেসম্যানের কন্যা হয়েও তার দুর্বলতা সমাজের গরীব মানুষদের ওপর। ঝক্‌ঝকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়েও কাজ করছে ভলান্টাসের উড়িষ্যার অপারেটিং সাইটে – কালাহান্ডি গ্রামে। কালাহান্ডি গ্রাম – যে গ্রাম বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে সম্প্রতি এবং উন্নয়নবিদ্দের পরিসংখ্যান তালিকায় ঢোকার অনায়স যোগ্যতা অর্জন করেছে একটি সামান্য কারণে। এই কালাহান্ডি গ্রামের এক কৃষক পরিবার সপরিবারে মারা গেছে অনাহারে। অনাহারে মৃত্যু ? এই যুগে ? অবিশ্বাস্য। যেখানে একটু হাত পাতার ষ্টাইল জানা থাকলে ভিক্ষার ঝুলি উপচে পড়ে দয়া দাক্ষিণ্যে – সেখানে অনাহারে মৃত্যুটা কল্পনা করাই দুঃসাধ্য। সুতরাং কালাহান্ডি বিখ্যাত।

এই বিখ্যাত কালাহান্ডিতে ভলান্টাসের অফিসে নৈরঞ্জনা মুখার্জী Health project এর ডাইরেক্টর। এই কাজ করা হয়তো শখ, হয়তো অন্য কিছু, কে বলবে ? মানব চরিত্র অতল অন্ধকারে বিরাজমান।

ক্যাচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার – কইখালিতে ঢোকার মুখে বড় রাস্তার ধারে । সেখানে তার কি দরকারে নামতে হবে । নৈরঞ্জনার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয় । নিমেষে ছেঁকে ধরে ভিখারী ছেলে-মেয়ের দল । নামানো কাচের ভেতর তাদের হাত পৌঁছে যায় ।

নৈরঞ্জনা তাদের দিকে তাকায় না । জানালা তুলে দেয় । সুনীপার সাথে পরিচয় হবার আগে নৈরঞ্জনা কিন্তু দুহাতে গরীবদের ভিক্ষে দিতো । সুনীপা বলেছিল – এতে ওদের আরো গরীব করে দেওয়া হয় মানসিকভাবে । ভিক্ষে দিতে নেই । কথাটা নিয়ে ভেবেছিল নৈরঞ্জনা । শুধু সুনীপার কথা নিয়ে নয় – সুনীপাকে নিয়েও খুব ভাবে নৈরঞ্জনা । সুনীপারও ওরই মত ঝকঝকে ডিগ্রী কলকাতার নামী ম্যানেজমেন্ট সংস্থা থেকে । কিন্তু সব ছেড়ে ও বাড়ীতে ওর মায়ের পাশে থাকে – যিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু এবং মানসিকভাবে সুনীপার ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল । কিন্তু সুনীপাও মনেপ্রাণে চেয়েছিল এই ধরণের কাজ – যেখানে ও সমাজের হতভাগ্যদের জন্য কিছু করতে পারবে । কিন্তু ওর ভাগ্যও খারাপ । পারলোনা চাকরিটা নিতে ।

সুনীপা আর ও একই সাথে ইন্টারভিউয়েতে ডাক পেয়েছিল । ভলান্টাসের কলকাতার দরগা স্ট্রীটের অফিসে একই লাউঞ্জে বসে আলাপ হয়েছিল ওর সাথে । সুনীপাই চাকরীটা পেয়েছিল Project Director-এর । কিন্তু সুনীপা নেয়নি কলকাতা ছাড়তে হবে বলে । নৈরঞ্জনা ওর এই ত্যাগের মাহাত্ম্য বোঝে না । অবশ্য যদি সুনীপা চাকরীটা নিতো – নৈরঞ্জনা কি আজকের নৈরঞ্জনা তে পৌঁছাতে পারতো ? ভাবে নৈরঞ্জনা । তার খ্যাতি আজ অনেক দূর পৌঁছে গেছে । তার বই Reality of Kalahandil-র আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতি ।

তাছাড়া তার শরীর দয়ার শরীর । তাই কালাহান্ডি গ্রামের পার্বতী কিস্কুকে সে তুলে এনে রেখেছে তার কাছে । তার চিকিৎসার জন্য । পার্বতীর চোখের আলো ধীরে কমছে – তার প্রতিকারের জন্য ।

পার্বতীর একমাত্র ছেলে বিরসার সে স্পন্সর । তার সব খরচ যোগায় নৈরঞ্জনা । বিরসা থাকে কালাহান্ডি গ্রামে । স্কুলে পড়ে এবং অবসরে শালপাতার দোনা বানায় নিজের রোজগার করার জন্য ।

কিন্তু সুনীপার সঙ্গে নৈরঞ্জনার বন্ধুত্বের তাই বলে কোনো অঙ্গহানি হয়নি । যেকোনো প্রয়োজনেই নৈরঞ্জনাই ছুটে যায় সুনীপার কাছে । যেমন আজই পার্বতীর দেখাশোনা করার মেয়েটা অনুপস্থিত । সুনীপাকে বলতেই সুনীপা ওকে আশ্বাস দিয়েছে এই বলে যে – ওই স্বয়ং আজ পার্বতীকে দেখাশুনো করবে । নৈরঞ্জনা কৃতজ্ঞ বোধ করে সুনীপার এই সেবা পরায়ণ মনোভাবে । সত্যিই সুনীপা দরদী ।

আজ নৈরঞ্জনাদের কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিসের অ্যানুয়াল ফাংশান । প্রতি বছর যেমন হয় আর কি, তবে এবার একটু বাড়তি জাঁকজমক । একটা নাটকও মঞ্চস্থ হবে । দরিদ্র আদিবাসীদের জীবনালেখ্য । নৈরঞ্জনাই লিখেছে । যেখানে দেখানো হয়েছে কি নির্মম দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সেখানে । প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছে নৈরঞ্জনা স্বয়ং । নাটকের শেষে – শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে মনোনীত করা হবে । বহু বিশিষ্টজনই আসছেন এই ফাংশনে । তাই আজ নৈরঞ্জনার মনে আশা আছে সে'ই আজ শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পাবে । কারণ অভিনয় করাটা তার কাছে নতুন নয় ।

পার্বতীর অভিব্যক্তিগুলো মনে মনে সে আর একবার দেখে নেয় । অনেক মুদ্রাদোষ তার – অনেক ভঙ্গী – সেগুলো নৈরঞ্জনার খুব ভালোভাবেই জানা ।

- -

বিকেলের ফলাফল কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায় । আমাদের চেনা লাল বিদেশী গাড়ীটি দেখা যায় ছুটছে বাইপাস ধরে কলকাতার দিকে । আরোহিনী নৈরঞ্জনা মুখার্জী ডাইরেক্টর, ভলান্টাস । সন্ধ্যে হয় হয় । আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ যেন নৈরঞ্জনার মুখেও ছেয়ে আছে । ইস্টার্ণ বাইপাসের হু হু হাওয়াও এই গুমোট মেঘ সরাতে পারছে না ।

নৈরঞ্জনা আজ পরাজিত । আজকের অভিনয়ে সে কিছুই করতে পারেনি । এ একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে তার মনে

হচ্ছে। তবে কি তার কাহিনীতে আদিবাসী জীবনের নগ্ন দারিদ্রের রসদ যথেষ্ঠ পরিমাণে ছিল না ? তবে কি আরো কিছু ক্রুর বাস্তবের প্রয়োজনীয়তা ছিল ?

চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে 'শরৎবিহার' গেটটি নজরে এসে যাওয়ায়। নৈরঞ্জনার কলকাতার বাসভূমি।

ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে ওপারে উঠে আসে নৈরঞ্জনা। ইয়েল লক্ খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা মূর্তি প্রচন্ড আর্তচিৎকারে ভেঙ্গে পড়ে ওর পায়ের ওপর।

পার্বতী – পার্বতী কিস্কু – ওর পায়ের ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। সুনীপাকে দেখা যায় – সে এগিয়ে আসে, জোর করে পার্বতীকে তুলে ধরতে চেষ্টা করে।

পার্বতী আকুল চিৎকারে মাথা ঠুকছে মেঝেতে। তারই মধ্যে টুকরো টুকরো বিলাপ জুড়ে কিছুটা অর্থ পায় নৈরঞ্জনা। বাকীটা সুনীপা বলে।

বিরসা নেই। পার্বতীর একমাত্র সন্তান বিরসা। শালগাছ থেকে পা হড়কে পড়ে মরেছে। শালপাতা তুলছিল সে দোনা বানাবে বলে। দুপুরেই এসেছে এই দুঃসংবাদ।

নৈরঞ্জনার মনে তখন অনেক মেঘের আঁকিবুকি – অনেক উতলা বাতাস – অনেক অন্ধকার। সে অন্ধকারে ভেসে ওঠে একটা ভাবনা – ঘটনাটা যদি গতকালই হতো – তবে আজকের নাটকের কাহিনীতে যোগ হতে পারতো আরো কিছু মর্মস্পর্শী ঘটনা – তাহলে . . . .

ততক্ষণে নৈরঞ্জনা দেখে সুনীপা দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে পার্বতীকে। সেও কাঁদছে আর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে পার্বতীর চোখের জল।

গল্প

মা

অনিতা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা

বাড়ী বাড়ী ঘুরে চিঠি বিলি করাই রামলোচনের কাজ । দীর্ঘদিন এই কাজ করে চলেছে সে । এখন বয়স হয়েছে । তাই কোন পাড়ায় কোন বাড়ী, কোন বাড়ীতে কোন নামে চিঠি আসে সেটা তার জানাই হয়ে গেছে । নতুন নতুন ভাড়াটে এলে অবশ্য অসুবিধায় পড়তে হয় । দুপুরে যখন সে চিঠি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরে সব বাড়ীর দরজাই প্রায় তখন বন্ধ থাকে — নাম দেখে চিঠি দেওয়া, তাই মানুষটা যে কে তা সে জানতেই পারে না ।

অনেক সময় ইচ্ছে হয় একবার দেখতে নামের মালিককে । যাদের নামে বেশী চিঠি আসে তাদের দেখার তাগিদ রামলোচনের তত বেশী নেই । কিন্তু মাঝে মধ্যে রঙীন খামে মিষ্টিমধুর গন্ধ মাখা কোন মেয়ের নামে যদি চিঠি আসে এই বয়সেও তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে । নিজের যৌবনের দিনগুলো উঁকি মারতে থাকে নিজের ভিতরে ।

তখনকার দিনে মেয়েদের অনেক ঝামেলা ছিল । বাইরে বেশী বেরোতে পারত না — বেরোলেও পাহারাদার একজন থাকবেই । মেলা মেশায় বিশেষ সুযোগ ছিল না । কাজেই এই রকম চিঠি চট করে একটা আসত না ।

তার নিজের জীবনেও মেয়ে বলতে খালি উমাশশী । মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন । সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে । সংসার, রান্না খাওয়া, স্বামী শাশুড়ীর সেবা করা — এই সবই তার জীবনের লক্ষ্য ছিল । রোমান্স বা অনুরাগের ছোঁয়ার স্পর্শ ছিল না সেখানে । রামলোচন নিজেও অতশত বুঝতো না ।

গ্রামের সহজ সরল ছেলে — তাই অতি সাধারণ ভাবেই তার জীবন কেটেছে ।

লেখাপড়া পাঠ চুকিয়ে জীবন যুদ্ধে লেগে পড়েছে । সংসারে মায়ের কথাই সব, তাই মা যেমন বলতেন সে ভাবেই জীবন কাটিয়েছে সে ।

বিয়ে করার হুকুম হয়েছে, তো বিয়ে হয়ে গেছে । কলকাতায় এসে পোস্ট অফিসে এই পিওনের চাকুরীটা করতে করতে এখন অনেক কিছু শিখেছে সে ।

এখন বয়স হয়ে চারিদিকে দেখেশুনে প্রেমের অর্থ বুঝতে শিখেছে । তাই মুখে মৃদু হাসি নিয়ে রঙীন চিঠি বিলি করে বেড়াচ্ছে ।

আজ দুদিন ধরে রামলোচনের চিন্তার শেষ নেই । একটা চিঠি তাকে উদভ্রান্ত করে রেখেছে । ‘হালদার বাবু রোড’ নামে কোন রাস্তা সে এত বয়সেও শোনেনি । নন্দদুলাল রায়-এর নামে একটা চিঠি, ৫ নম্বর হালদার বাবু রোড — এই ঠিকানায় এসেছে । মেয়েদের কাঁচা হাতের লেখা ।

কিন্তু এই নামের রাস্তার কোন সন্ধান নেই রামলোচনের কাছে । সে আগেকার দিনের মানুষ । তাই অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণ । এই চিঠিটা যে লিখেছে এবং এটা যার পাওয়ার কথা তাদের প্রতি তার তো একটা কর্তব্য আছে । চিঠি যথাস্থানে পৌঁছনোই তার কাজ । এই কাজে গাফিলতি সে একেবারে সহ্য করতে পারে না ।

মহাচিন্তায় দিন কাটছে তার । নন্দদুলাল রায়কে সে খুঁজে বার করবেই । জানে না কে এই চিঠি লিখেছে যদি খুব দরকারী হয় । চিঠিটা সে আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে । পোষ্টমাষ্টারবাবুর কাছে রাস্তাটার নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল । এই নামের রাস্তা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । পোষ্টমাষ্টারবাবু চিঠিটার ভার তার হাতেই দিয়ে দিয়েছেন ।

অনেক খোঁজাখুজির পরেও বিফল মনোরথ হয়ে রামলোচন চিঠিটা যত্ন করে তুলে রাখে। রোজই রাস্তায় ঘোরার সময় মনটা খচখচ করে। নানান লোকের খবর নেয়। কিন্তু কোন লাভ হয় না। এইভাবেই প্রায় একমাস কেটে যায়।

আবার একদিন তার চিঠির থলি থেকে কাঁচা হাতের ঠিকানা লেখা নন্দদুলাল রায়-এর নামে একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে।

চিঠিটা হাতে পেয়ে রামলোচন ধপাস করে বসে পড়ে। হায় হায় কি যে হবে। জানি না কাদের সঙ্গে ভগবান এই খেলাটা খেলছেন — রামলোচন মধ্যে থেকে দোষী হয়ে পড়ছে। ভাবতেও খারাপ লাগছে তার। কি হবে কে জানে।

একদিন বসে ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। যত্ন করে রাখা চিঠি দুখানা বার করে প্রথম চিঠিখানার খাম খুলে দেখে। চিঠিটা এইভাবে লেখা —

বাবা নন্দ,

আজ পাঁচবছর তোমার কোন চিঠি বা খবর পাইনি। তোমার এই দুখিনী মাকে এই ভাবে কি করে ভুলে গেলে বাবা ? আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

নিতান্ত অসহায় হয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। এতদিন ধান ভেঙ্গে, নাড়ু তৈরী করে গ্রামের অন্যের বাড়ীতে নানা রকম কাজ করে নিজের খরচ চালাচ্ছিলাম।

কিন্তু শরীর এখন এতই দুর্বল ও খারাপ হয়ে পড়েছে যে আর কোথাও কাজ করার ক্ষমতা নেই। বাবা আমার বড়ই বিপদ। মাসে অন্ততঃ একশো টাকা না পাঠালে আমার ভাত জুটবে না। যদি এত টাকা না পার কিছু কম পাঠিও। তাতেও আমি একবেলা ফ্যানভাত খেয়ে চালিয়ে নেব।

কলকাতা গিয়ে টাকা রোজগার করে পাঠাবে বলে কথা দিয়েছিলে। মায়ের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখ বাবা।

আশাকরি ভাল আছ। পাড়ার রমাবৌমাকে দিয়ে এই চিঠি লেখালুম।

আশীর্বাদ জেন

আশীর্বাদিকা মা

চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্দ হয়ে বসে থাকে রামলোচন। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। ওঃ কি নির্মম ? এমন ছেলেও আছে ! নিজের মাকে কেউ এত কষ্ট দিতে পারে ভাবতেও পারে না রামলোচন। কোন এক দুখিনীমা সামান্য কটা টাকার জন্য ছেলের কাছে এইভাবে লিখেছেন। কলকাতায় এসে টাকা রোজগার করে মাকে পাঠায়নি ভাবতেও মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। নিজে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তখনই দ্বিতীয় চিঠির খামটা খুলে দেখে। এই চিঠিতেও না জানি আর কি লেখা আছে। আগের চিঠির উত্তর বা টাকা না পেয়েই নিশ্চয় কিছু লেখা হয়েছে। এক্ষুনি সেটা জানার জন্য চিঠিটা খুলে পড়াও শুরু করে —

বাবা নন্দ,

তোমার কাছে লেখা আগের চিঠির কোন জবাব পাই নি — কোন টাকাও তুমি পাঠাও নি।

বড়ই বিপদে পড়ে আবার তোমাকে এই চিঠি লিখছি। এটা জেনো, টাকা না পেয়ে আর কিছুতেই চলবে না। নিদেন পঞ্চাশটা টাকা তুমি এখুনি পাঠিয়ে দাও। বেশী টাকা আমার চাই না। এটুকু টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দাও। আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাই না বলেই এতদিন কিছু চাই নি। নেহাৎ নিরুপায় হয়ে এই চিঠি লিখছি।

আশীর্বাদ জেনো

তোমার দুখিনী মা

চিঠিটা পড়ে রামলোচন বাক্যহারা হয়ে পড়ে। চোখে জল এসে যায়। রাগে দুঃখে অদেখা নন্দলালকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। ছিঃ ছিঃ নিজের মাকে এত কষ্ট কেউ দেয় কি করে।

বাকী রাতটুকু না ঘুমিয়েই কেটে যায়। সকাল হতেই পোষ্ট অফিসে ছোটে রামলোচন। চিঠির ভেতরে লেখা গ্রামের নামটা পেয়ে পোষ্ট অফিস থেকে সেই গ্রামের পোষ্ট অফিসের সব খবর সংগ্রহ করে সে।

ওপরে নন্দদুলাল রায়-এর মা লিখে নিজের পকেট থেকে দেড়শত টাকা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়। নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে নিজেকে নন্দদুলালের বন্ধুর পরিচয় দেয় সে।

সেই দুখিনী মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মায়ের মুখখানা খালি মনে পড়ে যাচ্ছে তার আর দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

দিন পনেরো পর সেই কাঁচা হাতের লেখা একটি চিঠি তার ঠিকানায় আসে। না দেখা বউটি লিখেছেন, যেদিন রামলোচনের পাঠানো টাকাটা গ্রামে পৌঁছয় সেইদিনই ওই দুখিনী মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গ্রামের লোকেরা তার পাঠান টাকায় তাঁর শবদাহ ও শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাই তাড়াতাড়ি টাকা পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

চিঠি পড়ে রামলোচনের চোখদুটি জলে ভরে যায়। না দেখা মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় সে। ভগবান তার মাথায় এই বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন তাই তাঁকেও প্রণাম জানায়।

অনিতা মুখোপাধ্যায়ের ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখা ও আবৃত্তি আর গানের প্রতি আকর্ষণ ছিল। বেথুন কলেজের স্নাতক অনিতা ''সৌরভ সঙ্গীতায়ন'' থেকে ''সঙ্গীত ক্রিয়া বিশারদ'' উপাধিতে সম্মানিতা হন। সঙ্গে চলতে থাকে কবিতা ও গল্প লেখা। বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''বিরহী'' প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। গল্প সংকলন ''দুরন্ত জীবন'' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে, ''ঐশ্বর্য'' তাঁর নবতম কাব্য সংকলন যা স্বীয় দ্যুতিতেই কাব্য রসিকের নজর কাড়বে।

গল্প

বর্ণপরিচয়

নন্দিনী ঋদ্ধানশ, কলকাতা

অনেকদিন পরে বেশ খানিকটা সময়ের জন্য আজ আমি বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি, একা। অভ্যাস যে একেবারেই নেই, এমন নয়। তবে স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা কিন্তু ভাব গড়ে উঠেছে। সারাক্ষণ অন্য কারুর অজুহাতে আমার বাইরে বেরনো। ছেলে মেয়ের টিউশন, স্পোর্টস বা নাচের ক্লাসের জন্য, বা সংসারের বাজার করতে। ছুটির দিনে আমরা সবাই একসাথে সময় কাটাই, বাড়িতে বা বাইরে। আজ একা, নিজের কাজে বেরিয়ে তাই প্রথমে মনে হচ্ছিল কী যেন একটা নেই। সঠিক ভাবে বলতে গেলে, সামথিং ওয়াজ মিসিং।

মিসিং শব্দটি বড় অদ্ভুত। ব্যক্তি বা অনুভূতি, দুটোর ক্ষেত্রেই একে ব্যবহার করা যায়। অথচ বাংলায় সোজা অনুবাদ করলে ''আই অ্যাম মিসিং ইয়উ'' হয়ে যাবে ''আমি তোমাকে হারিয়েছি''। গুগল ট্রান্সলেটে ফেলে দেখলাম, বলছে মিসিং মানে অনুপস্থিত, নিরুদ্দেশ, বা পাওয়া যাইবে না এমন। ঠিক মনের মতো ব্যাখ্যা হল না। আমি যদি বলি নিজেকে মিস করছি, তার মানে তো এই না যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, আর কোনওদিন খুঁজে পাবো না। সময়ের সাথে সাথে সব মানুষই বদলে যায়, সেটাই তো স্বাভাবিক, সেটাই তো জীবনের আবহমান ধারার নিয়ম। ব্যক্তিত্বের কোনও কোণাই অপরিবর্তনীয় থাকে না। সবকিছু বদলে যায়। কুড়ি বছর আগেকার আমির সাথে যদি আজ হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যায়, নিজেই নিজেকে চিনতে পারব কি না সন্দেহ। রোজ আয়নায় নিজেকে দেখেও এই পরিবর্তন আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছে। অন্যদের সাথে অনেকদিন পরে দেখা হলে বুঝতে পারি যে সময় আর আমি, দুজনেই বদলে গিয়েছি। সুযোগ পেলেই যে ''মা, একটু আসছি'' বলে কয়েক ঘন্টার জন্য ঘুরতে বেরিয়ে পড়তো, তাকে আজ বাড়ি থেকে নিজের কাজের জন্য বের করা হয়েছে অনেক ধাক্কা দিয়ে। বরের সময় নেই, ছেলে-মেয়ে সঙ্গে আসতে নারাজ। বন্ধুবান্ধব সবাই নিজের নিজের সংসারের কাজে ব্যস্ত। আর কাজটাও তো নেহাত বোরিং — আধার কার্ডের জন্য লাইন দেওয়া। গতকাল সকালে বর এসে আমার নাম লিখিয়ে গিয়েছে যেখানে কার্ড বানানো হচ্ছে সেই অফিসে ওরা আজ দুপুরে আসতে বলেছিল।

''ফর্ম ভরে জমা দিয়েছি। রিসেপশানের ছেলেটি বসতে বলেছে।'' বরকে মেসেজ করে জানিয়ে দিলাম সব এখন অবধি ঠিকমতো এগিয়েছে। সময় কাটানোর জন্য করার মতো কিছুই নেই। খেয়াল করিনি যে সঙ্গে একটা বই নিয়ে এলে ভাল হত। আসলে ব্যাগে বই নিয়ে ঘোরার অভ্যাস চলে গিয়েছে অনেকদিন। প্রেম করার সময় অবধি তাও একটু আধটু ছিল, বিয়ের পর পদবী, গায়ের অলঙ্কার, স্থায়ী বাসস্থানের ঠিকানার মতো ব্যাগের গহ্বরটিতে বয়ে বেড়ানো বস্তুগুলোও পাল্টে গিয়েছে। বরের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে, রেস্তরাঁয় বা কফি শপে বই খুলে বসা যায় নাকি ? বিয়ের বছর দুয়েক পরে, সেজেগুজে বাইরেও যখন আমাদের মধ্যের কথোপকথনের ধরণ প্রায় বাড়ির মতই থেকে যেতে শুরু করেছিল তখনও ব্যাগ থেকে বই বার করে পড়ার ভাবনা মাথায় আসেনি। ততদিনে, লেখা শব্দের টানের রেশটা থেকে গেলেও ওদের সান্নিধ্যের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছি। তারপর আস্তে আস্তে প্রথমে মেয়ে তারপর ছেলের দুধের বোতল, জলের বোতল, ডায়পার, ওয়াইপ্স, জামা, খেলনা, চকলেট, এইসবেই আমার ব্যাগ ভরে উঠল। এখন ওরা অনেকটাই স্বাবলম্বী, তাই আমার ব্যাগের গহ্বরটাও ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

খেয়ালের জট ছাড়াতে-ছাড়াতে নিজের নামটা অপরিচিত কণ্ঠে শুনতে পেলাম। মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম রিসেপশানের ছেলেটা আমাকে ডাকছে। ওর টেবিলে গিয়ে দাঁড়াতেই ফর্মের একটা শূন্য স্থানের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ''এখানে কিছু লেখেননি কেন ?'' নিজের ঠিকানার ওপরে ওখানে ''কেয়ার অফ বা প্রজত্নে লিখতে হত। ''ওহ, খেয়াল করিনি'', আমি একটু কুণ্ঠিত বোধ করলেও নরম সুরেই বললাম। মনে মনে ভাবছিলাম এত বয়স হল আমার, এখনো কেয়ার অফ লিখতে হবে কেন ? ''স্বামীর নাম বলুন'', ছেলেটি প্রায় জেরার সুরে বলল। বললাম। এদের সাথে তর্ক করে

লাভ নেই, তাই বললাম । বানানটাও বলে দিলাম । সঙ্গে আনা ঠিকানা আর পরিচয়ের প্রমাণ যাচাই করে আবার বসতে বলল । এতক্ষণ যে চেয়ারে বসেছিলাম, দেখলাম এরই মধ্যে অন্য কেউ সেখানে বসে পড়েছে । একটু অভিমান হল, নিজের জায়গায় অন্য কাউকে বসা দেখে । মেয়ের জন্মের সময় চাকরি ছাড়ার পরে একই ধরণের অভিমান অনুভব করেছিলাম যখন ফাইনাল সেটেলমেন্টের চেক নিতে গিয়ে আমার জায়গায় অন্য একটি মেয়েকে বসা দেখেছিলাম । আমার জায়গা বলে আদতেও কী কিছু আছে ? এখনো তো শুধু আমার নাম আমার পরিচয় নয় । স্বামী বা বাবার নাম বলতে হয় । বাড়ির মালিকানা যৌথ হলে কী হবে, ও গৃহকর্তা, তাই সবাই আমাদের বাড়ি চেনে ওর নামে, আমি হলাম পাড়াতুতো বৌদি ।

নতুন আরেকটা চেয়ার বেছে আবার বসে পড়লাম । প্রথমে বলেছিল ঘন্টা দেড়েক সময় লাগবে, কিন্তু সেই সময় তো অনেকক্ষণ আগে পার হয়ে গিয়েছে । চোরা উত্তেজনার চোটে সকালে ভাল করে ব্রেকফাস্ট করিনি । খিদে পেয়েছে । রিসেপশানে এখন অন্য একজন বসা । তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমার নাম ডাকতে কতটা সময় লাগবে । বললেন ''কুড়ি-পঁচিশ মিনিট'' । রাশভারী ব্যক্তিটিকে জানিয়ে যে আমি একটু সময়ের জন্য নিচে যাচ্ছি, বাইরে বেরিয়ে এলাম । ফুটপাথে প্রচুর খাবারের দোকান । পুরী-সব্জি, মোমো, চাউমিন, কুলচা-ছোলা, এমনকি খিচুড়ি পর্যন্ত রয়েছে । আবার সেই একই বিপদ, একা একা খাওয়ার অভ্যাস চলে গিয়েছে । কী খাবো বুঝে উঠতে পারছিনা । বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে নিঃসন্দেহে চাউমিন খাওয়া হত । শুধু বর আর আমি থাকলে লুচি বা কুলচা । খিচুড়ি খেতে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু একা বেরিয়েছি বলে আমি খিচুড়িই বা খাবো কেন ? কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম একটা চায়ের দোকান । ডিম পাউরুটি সাজানো রয়েছে । অনেকদিন দোকানের ডিম পাউরুটি খাওয়া হয়নি । বললাম ডাবল ডিমের অমলেট আর বাটার টোষ্ট দিতে । সঙ্গে গ্লাসে করে চা । প্রথম কামড়েই যেন মনের ওপর জমে থাকা অনেকগুলো বছরের ধুলোর ওপর আঁচড় পড়ল । আমার মর্নিং কলেজ ছিল তাই ভোরবেলা দাঁত মেজে চা বিস্কুট খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হত । ক্লাসের ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে ডিম টোষ্ট খেতাম বন্ধুদের সাথে । আজ মুখে যেন আবার সেই স্বাতন্ত্রের স্বাদ ।

ঠোঁটের ফাঁকে হাল্কা হাসি নিয়ে আমি আবার ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম । কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার নাম ধরে আবার ডাকল । আমার হাতে আগে জমা দেওয়া ফর্ম ধরিয়ে দিয়ে ভেতরের কেবিনে চলে যেতে বলল । ওখানে ছবি তুলল, চোখের মণি আর ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যান করল । ইউনিক আই ডী কথাটা শুনে বেশ ভাল লাগল । তাহলে কিছুতো হল এখনো যা আমার নিজস্ব সত্তাকে অন্য সব পরিচয়ের গন্ডির বাইরে রাখতে সক্ষম । হলই বা বায়োম্যাট্রিক্স টেকনোলজি দিয়ে প্রমাণিত । আমার মতো আর কেউ নেই, অন্য কেউ আমি হতে পারবে না, সেটা জেনে মনটা খুশী খুশী লাগছে ।

ওদের দেওয়া স্বীকৃতি পত্র নিয়ে বাইরে এসে বরকে ফোন করে জানালাম যে কাজ হয়ে গিয়েছে । ও বলল অ্যাপ দিয়ে গাড়ি বুক করে নিতে । ভাল মেয়ের মতো ''আচ্ছা'' তো বলে দিলাম, কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না । শহরের এই এলাকায় আমি আগে কখনো আসিনি, তাই একটু ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করছিল । ডান-দিকে যাব না বাঁ-দিকে, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না । কাজের জন্য ডান হাত ব্যবহার করি, বাঁ হাত হল যোগালি, তাই ওর মর্যাদা যেন ডান হাতের তুলনায় একটু কম । ''আজকে আমি বাঁ দিকেই যাব'' ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম । একটু এগিয়ে বুঝতে পারলাম সামনেই বড় রাস্তা, বাড়ি ফেরার হাতছানি । ইউ-টার্ন নিয়ে ফুটপাতের একধারে দোকান আর অন্য ধার ঘেঁসে বেড়ার মতো গজিয়ে উঠা স্টল দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম । শীত পড়েনি, তবুও মাটিতে প্লাস্টিক পেতে সাজিয়ে রাখা নানা রঙ্গের মোজার পসরা আমাকে টানছিল । ছেলে, মেয়ে, বর, কেউ এই কোয়ালিটির মোজা পরে না, আমিও বহুকাল পরিনা । বড় দোকান থেকে ভাল মোজা কিনে আনি সবার জন্য । কিন্তু এক সময় তো এই মোজাও পরেছি । তখন যদি স্কিন অ্যালার্জি না হয়ে থাকে, এখনো নিশ্চয়ই হবে না ? ''হলে দেখা যাবে''। একটু বেপরোয়া ভাবেই নিজের জন্য মোজা বাছতে মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়লাম । সবুজ আর সাদা ডুরে কাটা একজোড়া মোজা হাতে নিয়ে দাম জিজ্ঞেস করলাম । ''জোড়া চল্লিশ করে, তিন জোড়া নিলে একশ দশে দিয়ে দেব,'' মোজা বিক্রি করা বুড়ীর গলায় বেশ উত্তেজনা । এক জোড়াই পরব কি না ঠিক নেই, তিন জোড়া নিয়ে কী করব না ভেবেই, যৌবনের স্বভাব মতো বললাম ''একশতে দাও'' । বুড়ী মনে মনে ঠিক জানত আমি একশ বলব, তাই আর কিছু না বলে চোখের ইশারায় আমাকে মোজা বেছে নিতে বলল ।

সবুজ, বেগুনী আর হলুদ-এই তিন রঙ্গের মোজা ব্যাগে ভরে বুড়ীকে টাকা দিয়ে আমি আবার এগিয়ে চললাম। আর কিছু কেনার মতো চোখে পড়ছিল না। অনেক পুরনো একটি সিনেমা হলের সামনে ছোলা মাখা বিক্রি করছিল। দেখে খুব লোভ লাগল, তাই দশ টাকার ছোলা মাখা কিনেই ফেললাম। ঠিক আমার মনের মতো ঝাল দিয়েছে, যাকে আমাদের রান্নার দিদি বলে ''লক্ষ্মী ছাড়া ঝাল''। বাড়িতে একমাত্র আমিই ঝাল খেতে পারি। পারি বলাটা অর্ধ সত্য, আমি ঝাল খেতে ভালবাসি, কিন্তু অন্য কেউ খায় না তাই ঝাল ছাড়া রান্না হয়, আর আমিও রোজ পাতে লঙ্কা নিয়ে বসতে ভুলে যাই। না খেতে খেতে যা হয়, আজকে এই ঝাল ছোলা মাখা খেতে খুব ভাল লাগলেও আমার চোখ নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আয়কর ভবনের সামনের রাস্তায় রিসার্ভ করা পার্কিং স্পেসে দাঁড়িয়ে বাকি ছোলা মাখা খেয়ে, নাক মুখ রুমাল দিয়ে মুছলাম। ঝালের রেষটা জিভে আগুনের হল্কার মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তবুও জল খাবো না। আড় চোখে বুঝতে পারলাম সরকারী অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোক আমাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। অন্য সময় হলে বিরক্ত বোধ করতাম। এই মুহূর্তে ঠিক বিরক্তিভাব মনে বা মুখে কোথাও প্রকাশ পাচ্ছিল না, বোধহয় ঝালের প্রকোপ, তাই ওদের সবার উদ্দেশে আমিও একবার হেসে তাকালাম। হাসিগুলো মিলিয়ে গেল না, বরং আরও আলোকময় হয়ে উঠল।

এই ঝাল মেশানো হাসি মুখ আর মন নিয়ে বাড়ি ফেরাই যায়। এবার সমস্যা ওয়ান ওয়ে-তে দাঁড়িয়ে কি গাড়ি বুক করা উচিৎ ? একটু এগিয়ে গেলেই হয়, কিন্তু ওই দিকটায় খুব গ্যাঞ্জাম। দোটানার মধ্যে এইদিক ওইদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় একটা সাদা ক্যাব এসে আমার কাছে দাঁড়াল। আমি যে অ্যাপ দিয়ে গাড়ি বুক করি এই গাড়ি সেই কোম্পানির কী না বুঝতে পারলাম না। এমনিতেও দেখেছি যে অ্যাপ সামনে দাঁড়ানো গাড়িকে বুকিং না দিয়ে দূরের গাড়িকে দিয়ে দেয়। কিন্তু আজ আমার এত অঙ্ক করতে ইচ্ছে করছে না। তাই বুকিং করে দিলাম। গাড়ির নাম্বার ফোনের স্ক্রিনে উঠে আস্তেই সামনে দাঁড়ানো ওই গাড়ির নাম্বার প্লেটের সাথে মিলিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, অঘটন ঘটেছে। এই গাড়িই আজ আমাকে দিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই গাড়ির ড্রাইভার আমার দিকে তাকালো। কেন জানি না, ওকে আমি এক গাল হেসে বললাম, ''আপনাকেই দিয়েছে''। ও হেসে বলল, ''হ্যাঁ, ভাগ্যিস। এর আগে দুজন আমাকে পুরো এলাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেষ মেষ ক্যান্সেল করে দিল।'' গাড়িতে বসে আমাকে আর কিছু বলতে হল না, আমার বাড়ির লোকেশন ওর মোবাইল অ্যাপ-এ দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমি বলে দিই কোন রাস্তা ধরে যাব, কিন্তু আজ বলতে ইচ্ছে করছে না। যদি একটু ঘুরিয়ে ও নিয়ে যায়, ভাড়ায় কতই বা তফাত হবে ? ''ভেতরের রাস্তা দিয়ে নিচ্ছি, বড় রাস্তায় খুব জ্যাম।'' ও নিজে থেকেই বলল। কিছু দূর গাড়ি এগিয়ে সিগন্যালে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ওর অন্য ফোন বেজে উঠল। অন্য পক্ষ কী বলছে আমি ভাল করে শুনতে না পেলেও ওর কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে কোনও একটা ক্যাবের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর সেই গাড়ির ড্রাইভার খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। আমার ড্রাইভার তাকে বোঝাচ্ছে যে ভয় পেয়ে লাভ নেই, যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে, প্রাণে বেঁচে গিয়েছে সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, গাড়ি তো মেরামত হয়েই যাবে। ওর বোধহয় হঠাৎ খেয়াল হল যে আমি সব শুনেছি। কলার-কে বলল যে ও ট্রিপে আছে, পরে কথা বলবে। ফোন রাখার সাথে সাথেই সিগন্যাল সবুজ হয়ে যাওয়াতে ও আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল।

গাড়িতে হাল্কা ভলিউমে রেডিও চলছে। আমার তখনকার সদ্যপ্রাপ্ত যৌবনকালের খুব প্রিয় একটি গানকে নাকি ইদানীংকালে কোনও এক পেছন-পাকা ছোকরা রিমিক্স করে গানটার বারোটা বাজিয়েছে। ফেসবুকে এই নিয়ে প্রচুর ট্রোল দেখেছি। নতুন ভার্সনটি রেডিও ষ্টেশনে বাজাচ্ছে বুঝতে পেরে ড্রাইভারকে বললাম ভলিউম বাড়িয়ে দিতে। নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করার জন্য ওয়াকিবহল থাকা প্রয়োজন। কুড়ি সেকেন্ড শুনেই পুরনো গানটির আত্মার জন্য মনে মনে শান্তি কামনা করলাম। ড্রাইভারেরও বোধহয় পছন্দ হয়নি গানটা। ও আপনাআপনি ভলিউম কমিয়ে দিল। আমি তখনো পুরনো গানটি মনে মনে গাইছি, খেয়াল করিনি যে ড্রাইভার আমাকে কিছু বলছে। ও বলছিল ''আমার অন্য গাড়িটার আজ ভোরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছে। ওর চোট লাগেনি কিন্তু গাড়িটা পুরো দুমড়ে গিয়েছে। তবে ড্রাইভার ঠিক আছে সেটাই সব থেকে বড় ব্যাপার। আমাদের লাইনে জীবনের ঝুঁকি তো লেগেই থাকে। সকালে গাড়ি নিয়ে বেরোলে ঠিক থাকে না রাতে বাড়ি ফিরব কী না।'' ও যেন নিজের সাথেই কথা বলে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষের উক্তিটা শুনে আমি কিছু না বলে থাকতে পারলাম না।'' ''না না, এইসব কথা বলবেন না। সব ব্যবসাতেই ঝুঁকি থাকে কিন্তু আপনাদের ঝুঁকি তো প্রাণের, তাই ভয় থাকাটাই

স্বাভাবিক। অনেক অ্যাকসিডেন্টে তো একজনের ভুলের খেসারৎ আরেকজনকে দিতে হয়।'' মাঝে মধ্যে আমি একটু বেশী ব্যাখ্যা করে ফেলি। শেষের কথাটা না বললেই হত। ও কোনও উত্তর দিল না। আমিও নিজের বোকা উক্তির জন্য নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেলাম। নিউ মার্কেটের ভেতরের সরু গলি দিয়ে গাড়ি ডান দিকে ঘুরছিল পিয়ারলেস ইনের দিকে। রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়ানো তিনজন যুবতি একটা ফোনে কিছু দেখছে খুব উত্তেজিত ভাবে। ''রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেলফি দেখছে, আমার গাড়ি যদি ওদের একটুও ছুঁয়ে যায়, চেঁচিয়ে আমার সাত পুরুষের উদ্ধার করে দেবে'', ও হাল্কা বিদ্রূপের সুরেই বলল। আমি কিছু না বলে শুধু হাসলাম। ওর নিখুঁত আন্দাজের কথা ভাবছিলাম। ঠিকই তো, তিনটি মেয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা ফোনে আর কী দেখতে পারে ? গাড়ির চাকাগুলো দুবার পুরো ঘোরার আগেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের নানা বয়সের অনেক মানুষের জটলা। ওদের দিকে তাকিয়ে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, ''কী কিনছে এত লোক ?'' আমি ঘাড় উঁচু করে দেখলাম ঘেরাটোপের মাঝখানে একটা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লোক, যার সামনে স্ট্যান্ডের ওপর রাখা রয়েছে নানা রঙ্গের পাথরবসানো আংটি। ''ভাগ্য বদলের খেলা চলছে। একটা আংটি দিয়ে সবাই নিজের ভাগ্য বদলাতে চায়।'' আবার ওর নির্ভুল এন্যালিসিস। আমি হাসতে গিয়েও হাসলাম না, নিজের আঙ্গুলের শোভাবর্ধন করা সোনায় বাঁধানো পলা আর পান্নার দিকে তাকিয়ে। স্টিয়ারিং উইল ধরে ওর হাতগুলো দেখলাম। বেশ লম্বা আঙ্গুলগুলো, নখ যত্ন করে কাটা। কোনও আংটি নেই। ভাল কোয়ালিটির শার্টের কাফগুলো পরিষ্কার। হাতের মোচড় বাহুর মাংসপেশি ফুলে ওঠাতে বুঝলাম শরীরচর্চা করে। এতক্ষণের বলা ওর কথাগুলোয় অনেক ইংরেজি শব্দ থাকা সত্বেও জামাকাপড় আর শারীরিক গুণাবলী দেখে এখন মনে মনে ভাবলাম, 'নাহঃ, এ সত্যিই এই গাড়ির মালিক। ঢপ দিচ্ছে না''। ওকে আর আমার ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভার ভাবতে পারছিলাম না। ও সার্ভার না, সার্ভিস প্রভাইডার। খুব সূক্ষ্ম ফারাক আছে দুটোর মধ্যে।

নিজের মনের সংস্কার নিজের কাছেই হঠাৎ করে ধরা পড়ে যাওয়াতে আমি একটু গুটিয়ে গেলাম। কোথায়, কবে শিখেছি আমি এইভাবে বর্ণ বিচার করতে ? আমার বাবা খুব রেগে যেতেন 'চাকর' কথাটা শুনলে। সাধু ভাষায় ভৃত্য বলাও ছিল বারণ। বাবা বলতেন যারা চাকরি করে তারা সবাই চাকর। তাই আমাদের বাড়িতে ঝি না বলে বয়স বুঝে বলা হত কাজের দিদি বা মাসী। ইংরেজিতে ডোমেস্টিক হেল্প। মা বলতেন, ''তোর বাবার হচ্ছে যত আদিখ্যেতা। ওরা ছাই বুঝছে এই সম্মানের ফারাক। মঞ্জু তো নিজেই বলে 'আমি বৌদির ঝি'। মঞ্জুদি ছিল আমাদের কাজের দিদি। শ্বশুর বাড়িতে অবশ্য এইসব নিয়ে কোনও চাপ ছিল না কোনোদিন। বরং আমার কাজের লোকের প্রতি এই সমীহের জন্য আমার ননদরা আমাকে আড়ালে 'ন্যাকা' আখ্যা দিয়েছিল। আমি যে আসলে ন্যাকা না সেটা প্রমাণ করার জন্যই আস্তে আস্তে ওদের ধরণের সাথেই খাপ খাইয়ে নিয়েছি। বৈদিক যুগের মতো এখন আমিও ব্যক্তির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তার বর্ণ পরিচয় নির্ধারণ করি।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমার চোখদুটো গাড়ির স্বচ্ছ কাঁচের ওপরে লাগানো রিয়ার ভিউ আয়নার ওপর গিয়ে আটকে গেল। ওর মুখের অর্ধেকটা ওই আয়নায় দেখা যাচ্ছে। মাথায় ঘন চুল, হাল্কা কোঁকড়ানো। আজ হয়তো স্নান করার সময় পায়নি, তাই চুল এলোমেলো হয়ে রয়েছে। প্রশস্ত কপালের আরেক প্রান্তে শুক্ল পক্ষের আকাশে একদশীর চাঁদের লুকিয়ে থাকা অংশের মতো এক জোড়া ভুরু। রাজকীয় নাক। গাড়ি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ ধরে আর ও অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখগুলো দেখতে পারছিলাম না। চোখের উপরের পাতার ভেতরের কোণগুলোতে ছোট ছোট সাদা দুটো দাগ। বোধহয় কোলেস্টেরলের সমস্যা রয়েছে। হঠাৎ ও চোখ তুলে আয়নার দিকে তাকাল। গাঢ় বাদামী রঙ্গের উজ্জ্বল মণি দুটো আমাকে দেখছে। আমার চোখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু পারলাম না। আয়নার মধ্যে আমাদের চোখ চারটে আটকে থাকলো। সিগন্যাল সবুজ হয়ে গিয়েছে। ও চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতে শুরু করল, আমিও।

আমি কিছুই ভাবছিলাম না তবুও আমার কাছে এক মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল কেন গান পছন্দ না হওয়ায় ভলিউম আপনাআপনি কমে গিয়েছিল। জানিনা অনেকক্ষণ কোনও কথা হয়নি কিন্তু গাড়ির পরিবেশটা যেন বদলে

গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম ও একটু অস্বস্তি বোধ করছে। ভাবলাম কী নিয়ে কথা শুরু করা যায়। ভোর বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। একটা গাড়ি গ্যারেজ, আরেকটাকে বন্ধ রাখলে আরও বেশী ক্ষতি হবে হয়তো নিজেই এই গাড়ি নিয়ে ও রাস্তায় নেমেছে। মানসিক চাপের মধ্যে থাকা মানুষকে তাঁর সমস্যার কথা আবার মনে করিয়ে দেওয়াটা বিবেচনাহীনতার পরিচয়। আমার কী মনে হল জানি না, মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পরে বুঝতে পারলাম আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি, ''আপনি কিছু খেয়েছেন ?'' ও রিয়ার ভিউ আয়না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ''না। খুব খিদে পেয়েছে। ভাবছিলাম কিছু খাবো কিন্তু তখনই আপনার বুকিংটা এলো। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে ব্রেক নেব।'' আমি বললাম, ''আমরা কিন্তু কয়েক মিনিট কোথাও দাঁড়াতেই পারি, আপনি নিজের জন্য হাল্কা কিছু খাবার কিনে নিন।'' ও মাথা ঝাঁকাল ''না, ঠিক আছে।'' পরের সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, আমরা দুজনেই চুপ করে আছি, এমন সময় হঠাৎ বলে উঠল, ''আচ্ছা, খালী পেটে নারকেল খাওয়াটা কি ঠিক হবে ?'' আমি তেড়ে উঠলাম ''না, না, একদম খাবেন না।'' ও আবার হাসল, ''এমনিতেও নারকেল আমি খুব একটা পছন্দ করি না। কাল আসলে আমার মাসীর বাড়িতে ঠাকুরের উৎসব ছিল। লাঞ্চ করেছি প্রায় শেষ বিকেলে, তাই ডিনার করিনি। আর আজ ভোরে বেরোতে হল।''

এর উত্তরে কী বলব ভাবছিলাম, তখন ও নিজেই আবার বলতে শুরু করল, ''কাল গাজরের আচার বানিয়েছিল আমার মাসী। আমার খুব প্রিয়। আমার জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছে, কিন্তু আমি আনতে ভুলে গিয়েছি। কাছেই থাকে মাসী। আজ রাতে আচারটা নিয়ে আসতে হবে নইলে সবাই মিলে শেষ করে দেবে। আপনি খেয়েছেন কখনো গাজরের আচার ?'' আমি মাথা নাড়ালাম। সেটা ও দেখতে পায়নি ভেবে বললাম, ''না, খাইনি। আমার আসলে আচার ততটা ভাল লাগেনা। শুধু লাল লঙ্কায় পুর ভরে যেই আচারটা বানানো হয়, সেটাই খাই। আমার শাশুড়ি বানান।'' মনে মনে ভাবছিলাম ওর মাসীর বাড়ি পার্ক স্ট্রীট এলাকার কাছাকাছি কোথায় হতে পারে। যদি আমি বলি, তাহলে ও কি আমাকে ওর মাসীর বাড়ি নিয়ে যাবে গাজরের আচার খাওয়ানোর জন্য ? এরপর অনেকক্ষণ ও আর কোনও কথা বলল না। হয়তো আমার পারিবারিক বৃত্তের কথা ভাবছিল। বা হয়ত কিছুই ভাবছিল না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও মাঝে মধ্যেই আয়না দিয়ে আমাকে দেখছিল। আমার তাতে একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, কিন্তু সেটা এই জন্য না যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি, যার আপাতত পরিচয় যে সে আমার ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভার, আমাকে দেখছে। আসলে অনেক বছর ধরে কেউ আমাকে ভাল করে দেখেনি। সবাই আমার দিকে তাকায়, কিন্তু কত জন আমাকে দেখতে পায়, আমি জানি না। আর যারা তাকায় ওরা আমার মধ্যে কোনও এক সম্পর্ককে খোঁজে বা আমার এক তরফা একটা রূপ দেখতে পায় – মা, স্ত্রী, বৌদি, মেয়ে, ছেলের বউ, বা এই রকমই অন্য কেউ। সবকটাই আমি, কিন্তু এক-একটা সম্পর্কের পরিভাষার বাইরে যে আমিটা পরে থাকি, তাকে কি কেউ দেখতে পায় ? পরিচয়ের সংজ্ঞার বাইরে পরে থাকা আমার অংশগুলো কি হারিয়ে গিয়েছে- ''আর দোস পার্টস মিসিং'' ?

''আপনি কি বাঙালি ?'' ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল। আমি হেসে বললাম ''হ্যাঁ।'' ও বলল ''আপনাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না'' খুব জানতে ইচ্ছে করছিল যে আমাকে দেখে ওর ঠিক কী কী মনে হচ্ছে, কিন্তু আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। হয়তো উত্তর জানার মতো সাহস আমার নেই। এটা জানার সাহসও নেই যে একজন অপরিচিত মহিলার দিকে ওর এই বারবার তাকানোর মানে কী হতে পারে। আমার এই হঠাৎ চুপ করে যাওয়াতে ও যেন একটু নিস্তেজ হয়ে পড়ল। বাকি রাস্তা আমরা আর কোনও কথা বললাম না। কথা ফুরিয়ে যায়নি, সামাজিক মর্যাদার শেঁকল আমার ভাবনার ভাষাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এতক্ষণে আমি এটা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েছি যে পর-পুরুষের দৃষ্টির সম্মোহনে হঠাৎ ভাললাগা খুঁজে পাওয়া ঠিক কিনা ?

অন্যরা আমার বিষয়ে কী ভাববে ? হয়তো বলবে 'মিড লাইফ ক্রাইসিস'', মাঝ বয়সে গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে নিজের আলাদা অস্তিত্বের স্বীকৃতি চাইছি। কিন্তু ওদের ভাবনায় সত্যিই কি কিছু এসে যায় ? আমার মন তো কোনও গন্ডী পেরোতে চাইছে না। আমার উপর এসে আটকে যাওয়া এক ব্যক্তির দৃষ্টি আমি উপভোগ করতে পারছি। জানতে চাইছি, আমার ইতিহাস, আমার পরিচয়, কোনও কিছু না জেনেও ও আমার মধ্যে কিসের সন্ধান পেয়েছে যে বারবার আমাকেই

দেখছে ? বাহ্যিক বিপর্যয়কাল আমি কি ওর কাছে এক মুহূর্তের ভাললাগা ? নাকি এই যাত্রাটুকুই আমাদের সম্পর্ক ? একসাথে চলা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু সম্পর্কটা মনে গাঁথা থাকবে বহুকাল ?

মাঝেমধ্যে আয়না দিয়ে ও আমাকে দেখছিল, কখনো আমি ওকে দেখছিলাম । দুজনেই খুব সাবধানে, যাতে অন্যজন বুঝতে না পারে । অথচ আমি আড় চোখে দেখছি যে ও আমাকে দেখছে । ও-ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে ? বাড়ির কাছে পৌঁছে আমি গাড়ি থামাতে বললাম । ব্যাগের ভেতর হাতড়ে এমন কিছুই পেলাম না যা ওকে দেওয়া যায় । আমার ব্যাগতো অনেককাল আগেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল । টাকার পার্স বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম । তিন টাকা আমার ফেরত পাওয়ার কথা । আমি চাইলাম না, ও-ও কিছু বলল না । থাক, ও আমার ঋণী হয়েই থাক । ওর ঋণ তো আমিও মন খুলে মেনে নিয়েছি । নামার সময় ও ঘুরে সরাসরি আমার দিকে তাকাল । আমিও প্রথমবার, এবং শেষবারের মতো ওর চোখে চোখ রাখলাম । হয়তো এক মুহূর্তের জন্যই, তবু এই দৃষ্টি আমি দীর্ঘ কাল মনে রাখব । শেষ বারের মতো হেসে বললাম, ‘‘এবার কিছু খেয়ে নিন ।’’ ও হেসে হাল্কা করে বলল ‘‘আচ্ছা ।’’

রাতে একবার মনে হল ওকে ফোন করে জিজ্ঞেস করি ও কিছু খেয়েছে কি না; কখন খেলো, কোথায় খেলো; আমাকে নামিয়ে দিয়ে কোথায় গেল; ওর গাড়িতে বসা পরের জনকেও ও আয়নার মধ্যে দিয়ে বারবার দেখছিল কিনা । হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যেত । ও এটাকে অন্যভাবে নিতে পারে । সময় আর সমাজ আমাকে শিখিয়েছে সরলতা স্বাভাবিক নয়, সহজ ভাবনা ব্যক্ত করার আগে বিবেচনা করা উচিৎ অন্যরা সেটাকে কী চোখে দেখবে । ফোন না করাটাই উচিৎ, সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও অ্যাপটা খুলে ওর নাম্বারটা দেখতে ইচ্ছে করল । ফোনে ওর গলা কেমন শোনায় সেটা জানতে ইচ্ছে করছিল ।

ট্রিপ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে ওর ফোন নাম্বার দেখতে পেলাম না । আমাদের দুজনের ফোনেই অপরের কন্টাক্ট ডিটেলস লক হয়ে গিয়েছে । দুপুরে যখন চেয়েছিলাম যে এই যাত্রাটা যেন ওর সাথেই করি, তখন এতটাই কাছে ছিল যে ফোন করে ওকে খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি । ফোন নাম্বার না থাকায় আমার জীবন থেকে ও চিরকালের জন্য মিসিং হয়ে গেল হয়তো; আবার কোনোদিন দেখা হলে ও আমাকে চিনতে পারবে কি না জানিনা । কিন্তু নিজের মধ্যে কিছু একটা মিসিং ছিল যা আমি আজ নতুন করে খুঁজে পেয়েছি । এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলাম । রিয়ার ভিউ আয়নার মধ্যে দিয়ে এক জোড়া ক্লান্ত অথচ উজ্জ্বল চোখ তখনো আমাকে দেখছিল ।

নন্দিনী ঋদ্ধানশ । পেশাগত আর নেশাগত ভাবে শব্দের জগতের বাসিন্দা । স্বভাবে বোহেমিয়ান । কখনো মাছ হয়ে গভীর জলের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় আবার কখনো পাখী মনের ডানা মেলে নীল আকাশের দিকে ছুটে যায় । নিজের অস্তিত্বের অর্থ খোঁজা প্রধান লক্ষ্য । ভালোবাসে অন্যদের বলা গল্প আর বৃষ্টির গান শুনতে । জন্মস্থান শিলং, বর্তমান নিবাস কলকাতা, কর্মভূমি মানব মন ।

অনুবাদ

অভিশপ্ত

পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ: সুজয় দত্ত)

বিরাট খামার বাড়ীর সুদৃশ্য পোর্টিকোয় একটা সাদা গাড়ী এসে থামল । খামার বাড়ীর কর্মচারীরা আগে থেকেই পোর্টিকোর দুদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আপেক্ষা করছিল । উর্দিধারী ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পিছনের সীটে বসা মালকিনের জন্য দরজা খুলে দিতেই তিনি গায়ের শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন ।

'রাম সিং, ভাইসাবকে হুইল চেয়ারে বসাতে হবে । খুব সাবধানে বসিয়ো, একটুও যেন ঝাঁকুনি না লাগে ।'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না মাঈজী । আমি আপনার সেবক । ভাইসাবকে একদম চোখের মণি করে আগলে রাখব ।' বলে কর্তব্যপালনে তৎপর হয় রাম সিং । গাড়ীর ট্রাংকের মধ্যে রাখা হুইল চেয়ার নীচে নামিয়ে পিছনের সীটে বসা যুবককে একপ্রকার কোলে করে তাতে বসিয়ে দেয় । তারপর চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে মালকিনের সঙ্গে লনের দিকে এগোয় । সেখানে কয়েকটা চেয়ার পাতা ছিল আগে থেকেই ।

'এখন কিছুদিন ভাইসাবের সঙ্গে এখানেই থাকবেন তো মাঈজী ?' বিনম্র স্বরে জানতে চায় সে ।

'হ্যাঁ, সেরকমই ইচ্ছে । ডাক্তার হাওয়াবদলের পরামর্শ দিল যখন, ভাবলাম খামারবাড়ীর খোলামেলা আলো-হাওয়ায় উপকার হতে পারে ।'

'আপনি আমাদের ওপর ভরসা রাখুন মাঈজী । আমি নিজে সকাল-সন্ধ্যে ভাইসাবকে খামারের চারপাশে ঘুরিয়ে আনব । বাগানে নিয়ে যাব । দেখবেন, দু-চার দিনেই এখানকার জলহাওয়ায় আর আদরযত্নে ভাইসাবের গা দিয়ে জেল্লা বেরোচ্ছে —'

'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, রামসিং । ভগবানের ইচ্ছেয় তাই যেন হয় । শৈলেন্দ্র তো এখানে আসতে চাইছিল না একেবারেই । কী কষ্টে যে রাজী করিয়েছি । কী ঝকঝকে রোদ দেখেছিস এখানে, শৈলু ? ভাল লাগছে না ?' হুইল চেয়ারে শায়িত ছেলের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন মা ।

'চা আনতে বলি, মাঈজী ?'

'হ্যাঁ, মন্দ হয়না । তুই কী খাবি, শৈলু ? গরম দুধ বলি এক কাপ ?'

'না না, এখন কিছু চাইনা — তুমি যা নেওয়ার নাও', অন্যমনস্ক উত্তর এল ছেলের । মুখে অনিচ্ছা প্রকট ।

'ঠিক আছে । রাম সিং, আমি চা-ই খাব । ক্লান্ত লাগছে খুব । শহরের মধ্যে ট্রাফিক জ্যামে ফেঁসে গিয়ে তিন ঘন্টার জায়গায় পাঁচ ঘন্টা লাগল এখানে আসতে ।' রোদের তেজ বাড়ায় গায়ের শালটা খুলে পাশের চেয়ারে রাখেন মা ।

বিজলী ট্রে-তে চায়ের সরঞ্জাম এনে মালকিনের সামনে রাখতে ওকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি, 'এটা আবার কে, রাম সিং ?'

'ওকে চিনতে পারলেন না ? ও আমাদের ভিখুর মেয়ে, মাঈজী । আরে অ্যাই মেয়ে, মাঈজীর পা ছুঁয়ে পেন্নাম কর !'

বিজলীকে আশীর্বাদ করে মালকিন ভিখুকে শুধোন, 'তোমার তো অনেকদিন বৌ নেই । মেয়েকে মানুষ করল কে ? কী সুন্দর ডাগর-ডোগরটি হয়েছে ।'

‘আজ্ঞে, ও মামাবাড়ীতেই বড় হয়েচে। ওখেনেই ছিল এদ্দিন, সবে চারদিন হল এয়েচে এখেনে। এবার এর বিয়ে-থা দিয়ে এট্টু নিশ্চিন্দি হতে চাই, মা-ঠাকরুণ। আবাগীর বেটি অনেক দুখ্‌খু পেয়েচে। মাত্তর দশ বছর বয়েসে মা স্বগ্‌গে চলে গেল - আপনি তো সবই জানেন। এখন আপনার ছিচরণেই আবার এসে উটেচে।’ বলতে বলতে গলা বুজে আসে ভিখুর।

‘আরে দূর, মাঈজী থাকতে চিন্তা কী ? মেয়ের গায়েহলুদ দিয়ে, তার গাঁটছড়া বেঁধে তাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে তারপর তীর্থে গিয়ে রামভজন করগে যা।’ রাম সিং-এর কথা শুনে সবাই হেসে ফেলে।

বিজলী হুইল চেয়ারে শায়িত ছোটবাবুর দিকেও চায়ের পেয়ালা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শৈলেন্দ্র যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়, মুখটা রক্তশূন্য দেখায় তার।

‘কী হল, শৈলু ?’

‘ন্‌না, মানে, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। একটু শুতে হবে।’

ছেলের মুখের চেহারা দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মা। চায়ের পেয়ালা নাবিয়ে রেখে জানতে চাইলেন, ‘রাম সিং, ভাইসাবের ঘর তৈরী আছে তো ? একটু নিয়ে যেতে পারবে ওকে ?’

‘ভাইসাবের ঘর তো সেই পরশু থেকেই তৈরী। বিজলী ঝাড়পোঁছ সাফাই-টাফাই করে একদম ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে।’

ড্রইং রুমের ঠিক পাশেই এককালে শৈলেন্দ্রর ঘর ছিল। হুইল চেয়ার ড্রইংরুমে ঢুকতেই ওর নজর পড়ল দেয়ালে টাঙানো মানুষখেকো বাঘের ট্যাক্সিডার্মি করা মাথাটার ওপর। তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার চোখদুটো আর বড়বড় দাঁতগুলো দেখলে আজও মনে হয় এখুনি গিলতে আসছে। ঐ মেয়েটা যখন ছোট ছিল, বাঘের মাথাটা দেখে কী ভয় পেত। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ঢেকে ফেলত।

দুধসাদা বিছানায় ছেলেকে শুইয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন মা। শৈলেন্দ্র ক্লান্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ঘরের চারপাশ। সেই রাতে — সেই রাতে ঐ অন্য খাটটায় হরীশ শুয়ে ছিল। জীবনের শেষ রাত এখানে, এই ঘরেই কাটিয়েছিল সে। ভাবতে ভাবতে চোখ বুঁজে আসে শৈলেন্দ্রর।

‘আর কিছু লাগবে, শৈলু ?’

‘না, আমাকে শুধু একটু একলা শুতে দাও। তুমি চান-টান পূজো-আচ্চা করে নাও ততক্ষণ।’

‘ঠিক আছে। কিছু দরকার হলে এই ঘন্টাটা বাজাস, রাম সিং চলে আসবে’ বলে বেরিয়ে গেলেন মা। আর ছেলে ডুবে গেল পুরনো স্মৃতিতে। দু-বছর আগের সেই ঘটনা আবার চোখের সামনে সজীব হয়ে উঠল ওর।

বড়জ্যেঠার ছেলে ছিল হরীশ। শৈলেন্দ্রর প্রায় সমবয়সী, তাই দুজনে গলায় গলায় বন্ধু। জ্যেঠা মারা যাওয়ার পর থেকে শৈলেন্দ্রর সঙ্গেই বড় হয়েছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সময় একজন উঠতি বয়সের ছেলে যেসব জিনিসের স্বাদ পেতে শেখে, তার অনেক কিছুই শৈলেন্দ্র পেয়েছিল হরীশের মাধ্যমে। সে বিদেশী পত্রিকার উত্তেজক নারীচিত্রই হোক বা জীবনের প্রথম সিগারেট। শৈলেন্দ্র স্বভাবলাজুক বলে হরীশ ওকে নিয়ে কত হাসিঠাট্টাই না করত —

‘তোর তো মেয়ে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল রে। আরে বাবা, আমরা হলাম জমিদার বংশের পুরুষমানুষ। আমাদের এরকম হলে চলে ? তুই দেখছি এই বংশে একেবারেই বেমানান।’

যৌবনের বেপরোয়া আনন্দ হরীশ প্রাণভরে উপভোগ করত, আর শৈলেন্দ্র একপ্রকার বাধ্য হয়েই ওকে সঙ্গ দিত। এইভাবে আস্তে আস্তে ওর দ্বিধা-সংকোচ অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। এহেন হরীশ যখন দিল্লী চলে গেল কলেজে পড়তে,

বড় একা হয়ে পড়ল শৈলু। একবার হরীশ যখন বাড়ী আসছে দিল্লী থেকে, শৈলু গেল ওকে গাড়ী করে স্টেশন থেকে আনতে। রাঁচী স্টেশনে ট্রেন এমন সময় পৌঁছয় যে ওখানে আনতে গেলে অনেকক্ষণ ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে হবে। তাই তার বদলে বেশ কয়েক ঘন্টা গাড়ী চালিয়ে ও গিয়ে হাজির হল তার আগের স্টেশন পাত্রাতু।

পাত্রাতুতে ট্রেন থামতেই জানলা দিয়ে স্টেশনে অপেক্ষারত খুড়তুতো ভাইকে দেখে চমকে গেল হরীশ —

'আরে শৈলু, তুই এখানে!'

'কী করব? ট্রেন রাঁচী পৌঁছতে এখনো পাঁচ-ছ ঘন্টা। অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে বোর হয়ে যেতাম। বাবার গাড়ীটা নিয়ে এসেছি। তোর শুধু একটাই স্যুটকেস তো?'

হরীশের হাত থেকে স্যুটকেস ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ীর পিছনের সীটে ছুঁড়ে দিয়েই ওর গলা জড়িয়ে ধরেছিল শৈলু। হরীশ চোখ টিপে বলল, 'কী ব্যাপার, একটু রোগা হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে? কারো প্রেমে-টেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস না তো?'

'না না। তুই এসে গেছিস, আমার আর চান্স কোথায়? সব সুন্দরী মেয়েরা তো দেখি তোর কাছেই ভীড় করে। এই নে চাবি। আজ তুই চালাবি আর আমি আরাম করে তোর দিল্লীর গল্প শুনব।'

'ওকে বস্। অ্যাজ্ ইউ উইশ। তারপর? আমি দিল্লী যেতে না যেতেই ফার্মহাউসে অনেক বসন্তের ফুল-টুল ফুটিয়ে বসে আছ নাকি, চাঁদু?'

'না রে বাবা না। ওসব তো তোর পাল্লায় পড়ে করি আমি। নাহলে আমি হলাম যাকে বলে আপাদমস্তক পবিত্র মানুষ। তোর মতো লোকের অসৎসঙ্গে পড়েই আমার বারোটা বেজে যাচ্ছে —'

'দুত্তোর, নিকুচি করেছে পবিত্র মানুষের। আরে, জীবনের ভরপুর মজা উপভোগ করার এই তো সময়। পরের জন্মে গরু-ঘোড়া-ছাগল — কী হয়ে পৃথিবীতে আসবি কোনো ঠিক আছে?' হরীশ শিস্ দিতে দিতে বলল।

গাড়ী চলছে জি টি রোড ধরে। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের রং ছড়াচ্ছে। ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড়ের গায়ে গায়ে শাল-মহুয়ায় ফুল ধরেছে বোধহয়। বাতাসে তার গন্ধ ভেসে আসছে।

'নাঃ, এই ব্যাটাচ্ছেলে রাঁচী বড় সুন্দর জায়গা। এর কাছে দিল্লী কোথায় লাগে? ওখানে তো খালি উঁচু উঁচু বাড়ী', একসময় বলে ওঠে হরীশ।

'শুধুই উঁচু উঁচু বাড়ী? মেয়ে-টেয়ে দেখা যায়না রাস্তাঘাটে?' শৈলু ঠাট্টা করে।

আচমকা হরীশের সামনের দিকে কোনো কিছুর ওপর নজর পড়ায় ও ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে ভাইকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'আমি যা দেখছি, তুই তা দেখছিস?'

'কোথায়, তেমন বিশেষ কিছু তো নজরে পড়ছে না! শুধু ওখানে একটা মেয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।' 'মানে? মেয়ে দেখছিস আর বলছিস বিশেষ কিছু নয়?'

'আরে, ওরকম মেয়ে তো তুই এই চত্বরে হাজারটা পাবি —'

'না রে, এই আদিবাসী মেয়েগুলোর মধ্যে কী যেন একটা আছে যেটা শহুরে মেয়েদের মধ্যে পাওয়া যায়না।'

'জানিনা বাবা। এসব ব্যাপারে তোর মতো অত সূক্ষ্ম অনুভূতি আমার নেই। তুই তো একদম এক্সপার্ট।'

গাড়ীটা মেয়েটার কাছে পৌঁছতেই হরীশ সজোরে ব্রেক কষল। ব্লাউজহীন লালপাড় শাড়ীতে তেরো-চোদ্দো বছরের

মেয়েটা হঠাৎ ওভাবে গাড়ী থামতে দেখে চমকে গেল। ড্রাইভারের সীটে বসেই হরীশ জানতে চাইল,

'কিরে, শহরে যাবি ?'

মেয়েটা মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

'আমরাও শহরে যাচ্ছি। তোকে পৌঁছে দেব। গাড়ীতে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবি।' হরীশ হাত বাড়িয়ে গাড়ীর পিছনের দরজা খুলে দেয়।

'না না, আমি বাসেই যাব', মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়ে বলে।

'তুই জানিস না আজ বাস-টাস সমস্ত বন্ধ ? সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও বাস, ট্রাক, টেম্পো — কিছুই মিলবে না। আরে, আমরা ভালো লোক। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবি।' হরীশ খুব নরম গলায় আশ্বাস দেয়।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানায় মেয়েটা বারকয়েক ওদের দুজনকে দেখে। বলে, 'সত্যি সত্যি গাড়ী বন্ধ ?'

'ধ্যাত্তেরি, এতক্ষণ একটাও গাড়ী আসতে দেখেছিস ? তাড়াতাড়ি ওঠ, নাহলে আমরাও চলে যাব কিন্তু। দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের।' ধমক দেয় হরীশ।

আরো কয়েক মুহূর্তের দ্বিধার পর ভয়ে ভয়ে মেয়েটা গাড়ীতে উঠে পিছনের সীটে বসে। ওর অপরিচ্ছন্ন শাড়ীতে যাতে সীট নোংরা না হয়ে যায়, তাই একটু জড়োসড়ো হয়েই বসে। হরীশ দরজা বন্ধ করে লক্ করে দেয়।

'নাম কী রে তোর ?'

'ফুলওয়া'

'বাঃ বাঃ, খুব সুন্দর নাম। ফুলের মতো মিষ্টি মেয়ে ফুলওয়া — কী, ঠিক বলিনি শৈলু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর কথা আবার ভুল হয় নাকি ?' শৈলু মুচকি হেসে বলে।

'তা, এই ভর সন্ধ্যেবেলা শহরে যাচ্ছিস কেন, ফুলওয়া ?'

'চার দিন ধরে মা-র খুব অসুখ। ওষুধ আনতে হবে তো — তাই।'

'কেন, ঘরে ওষুধ আনার মতো আর কেউ নেই বুঝি ?'

'আর কে থাকবে বাবুজী ? দু-বছর আগে বাবা মা-কে ছেড়ে আরেকজন মেয়েমানুষের সঙ্গে চলে গেছে। মা শহরে গিয়ে শালপাতা বেচে আমাদের দুজনের খাওয়াপরা জোটায়। এই চার দিন একটা পয়সা ছিলনা ঘরে —' ফুলওয়ার গলা বুজে আসে।

'তুই আমার কাছে কাজ করবি ? আমি তোকে অনেক, অনেক পয়সা দেব।'

'কী কাজ ? কী কাজ করতে হবে বল ? আমি ঝাড়পোঁছ করতে পারি, বাসনকোসন মাজতে পারি। কত টাকা রোজ দেবে ?' উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে মেয়েটা।

'পছন্দসই মাইনে দেব। কিন্তু আমি যা বলব তাই করতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যা বলবে সব করব —'

হরীশ গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দেয় । ভয়ে সিঁটিয়ে যায় মেয়েটা । ককিয়ে ওঠে, 'বাবুজী, আমাকে শহরে যেতে হবে, শহরে —'

'আরে শহরে গিয়ে কী হবে, শুনি ? আমাদের সঙ্গে চল, মস্তি করব ।'

'না, আমি যাব না । আমি মা-র কাছে যাব । গাড়ী থামাও — থামাও বলছি —'

হরীশ গাড়ী থামিয়েছিল একেবারে ফার্মহাউসে এসে । শহর থেকে অনেক দূরে একেবারে নির্জন জায়গায় এই খামারবাড়ী । ওর জমিদার পূর্বপুরুষদের যাবতীয় লোভলালসা, অপকর্মের সাক্ষী । শৈলুর মনে পড়ে, ওর ছোটবেলায় বাবা যখনই খামারবাড়ীতে দু-চার দিন কাটিয়ে শহরে ফিরত, মা-র মুখটা কেমন মলিন হয়ে যেত ।

গাড়ী থামতেই হরীশ তাড়াতাড়ি নেমে ফুলওয়ার দিকের দরজাটা খুলে বলল, 'ভয় পাস না, এখানে খানিকক্ষণ থেকে আমি তোকে শহরে পৌঁছে দিয়ে আসব ।'

'না না, আমি এখানে থাকব না । আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও তোমরা —' আতঙ্কিত স্বরে বলে মেয়েটা ।

এমন সময় রাম সিং বেরিয়ে এসে দুই ছোটবাবুকে দেখে সেলাম করে দাঁড়াল । কয়েক মুহূর্তেই পরিস্থিতি বুঝে নিল সে । ফুলওয়াকে সান্ত্বনা দিতে লাগল — 'অ্যাই মেয়ে, আয় আয়, বাইরে আয় । একটু খাওয়াদাওয়া, আরাম-টারাম কর । আমরা তোর দেখভাল করব —'

বলে জোর করে ফুলওয়ার হাত ধরে ওকে ড্রইং রুমে টেনে আনতেই সামনে পড়ল সেই নরখাদকের ট্যাক্সিডার্মি করা মাথাটা । দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠল মেয়েটা, 'মা, মাগো, বাঘ — বাঘে নিল আমায় ।' দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ।

'আরে পাগলী, এটা কি সত্যিকারের বাঘ নাকি ? এর মুখের ভেতর হাত ঢোকালেও কিছু হবেনা । দেখবি ? এই দেখ —' বলে রাম সিং বাঘের করাল দংস্ট্রার মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে দেয় । এইবার ফুলওয়া সাহস করে ওর পিছন পিছন ঘরে গিয়ে ঢোকে ।

'ভাই রাম সিং, একটু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর তো দেখি । খুব খিদে পেয়েছে ।' হরীশ গায়ের কোটটা এক ঝটকায় খুলে সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল । তারপর ভয়ে, লজ্জায় কুঁকড়ে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে কাছে টেনে এনে বসাল ।

গরম গরম তন্দুরী চিকেন আর কাজুবাদামের সঙ্গে এল এক বোতল হুইস্কিও । যত্ন করে টেবিলে সাজিয়ে দিল রাম সিং ।

'এইতো ! এই না হলে চলে ? রাম সিং, তুমি দারুণ কাজের লোক । দেখো, আমাদের আজকের এই অতিথির নাম ফুলওয়া । যতক্ষণ আছে, এর যত্ন-আত্তির ভার তোমার । শহর থেকে ওষুধ নিয়ে ও মা-র কাছে ফিরবে ।' বলে অনুগত ভৃত্যকে চোখের ইশারা করে হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দেয় ।

'যো হুকুম, হুজুর । আমি এক্ষুণি ওষুধের ব্যবস্থা করছি ।' বলে বাইরে চলে যায় সে ।

রাত বাড়তে থাকে । ঘরের ভেতর নেশা চড়তে থাকে । নেশায় লাল দু-চোখ দিয়ে ফুলওয়ার শরীর যেন চাটতে থাকে হরীশ । মেয়েটার তখন ওদিকে নজর নেই । চার দিন না খেয়ে থাকার পর একটু খেতে পেয়েই সে আত্মহারা । যখন গায়ের ওপর একটা চাপ অনুভব করে চমকে তাকাল, ততক্ষণে হরীশ ওকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরেছে । জালে পড়া মাছের মতো ছটফট করতে থাকা মেয়েটাকে সেই মুহূর্তে বাঁচাবার কেউ ছিল না । ওর চীৎকার খামারবাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত

প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, কিন্তু বাইরের কারো কানে গিয়ে পৌঁছল না। আর শৈলেন্দ্রও বিনা প্রতিবাদে তার দাদার কুকর্মের সাক্ষী হয়ে রইল।

ভাবতে ভাবতে কেঁপে ওঠে শৈলেন্দ্রর গা-হাত-পা। 'কী হল শৈলু? শীত করছে?' হঠাৎ মায়ের গলা শুনে চমকে ওঠে ও।

'কিছু না, কিছু না, ঠিক আছি আমি —'

আঁচল দিয়ে ছেলের মুখ আর মাথার ঘাম মুছে চিন্তিতস্বরে মা বললেন, 'এই শীতে এত ঘামছিস যে? শরীর-টরীর খারাপ হল না তো? নাকি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিলি?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, তাই হয়তো —'

'এবার দুধ আনতে বলি?'

'থাক, এখনো তেমন ইচ্ছে করছে না। আর একটু শোবো। আলোটা নিভিয়ে দেবে, মা?'

ঘর অন্ধকার হতেই আবার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল সেই রাতের সেই ঘটনা।

ফুলওয়ার রক্তাক্ত, ধর্ষিত শরীরের দিকে পরিতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে হরীশ হাঁক পাড়ল, 'রাম সিং!'

'জী হুজুর'

'একে চারতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। এ এখন আমাদের সম্পত্তি। আবার দু-চার দিন বাদেই আমি আসব এখানে। তখন যেন — বুঝতে পারছ তো কী বলতে চাইছি?'

'হুজুর, ভরসা রাখুন আমার ওপর। আজ অবধি হুকুম তামিলে কোনো গাফিলতি করেছি, বলুন?'

ফুলওয়ার নেতিয়ে পড়া, অজ্ঞান দেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে তুলতে রাম সিং বলল, 'মাফ্ করবেন হুজুর, আজ বোধহয় একটু বেশীই করে ফেলেছেন। মেয়েটা বাচ্চা তো —'

কোটের পকেট থেকে দুশো টাকা বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হরীশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করল, 'দুদিন ভাল কোয়ালিটির মাল খাইয়ে দাও, দেখবে চাঙ্গা হয়ে গেছে। এসব আদিবাসী ছুকরীদের জান বহুত কড়া হয়।'

'ঠিক বলেছেন, হুজুর, ঠিক বলেছেন' বলতে বলতে রাম সিং চলে যায়। আর শৈলেন্দ্র কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'দেখ, মেয়েটা মরে-টরে গেলে বিপদে পড়ব না তো আমরা?'

'আরে দূর! মরে গেলে তো মিটেই গেল। এই এতবড় খামারবাড়ী — কোথাও এক কোণে পুঁতে দিলেই হবে। সেটা তো ওর সৌভাগ্যই বলতে হবে। এই জমিদারবাড়ীর এমন মহার্ঘ জমিতে শোয়ার জায়গা পাচ্ছে।' হেসে গড়িয়ে পড়ে হরীশ।

'পুঁতে তো দিবি। কেউ জেনে ফেললে তখন কী হবে?'

'নাঃ, শৈলু, তোর মতো ভীতু আমি দুটো দেখিনি। আরে, ওকে যেখানে পোঁতা হবে সেখানে কয়েকটা অশোক গাছও পুঁতে দেব।'

'অশোক গাছ? দাঁড়া দাঁড়া, লিটারেচার ক্লাসে অশোক গাছ নিয়ে কী যেন একটা পড়েছিলাম — ঠিক মনে পড়ছে না —'

'এটাই পড়েছিলি যে, সুন্দরীদের পদাঘাতে এই গাছ ফুলে ভরে ওঠে। ভেবে দেখ শৈলু — যে অশোক গাছের নীচে স্বয়ং সুন্দরী চিরশয্যায় শুয়ে আছে, তার তো প্রতিদিন ফুলের ভারে নুয়ে পড়া উচিত। ঠিক কি না?'

দুজনে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিল। হায়, তখন যদি ঘূণাক্ষরেও জানত কী হতে চলেছে!

ভোরের আলো ফোটার আগেই দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে রাম সিং-এর গলা, 'হুজুর, হুজুর, উঠুন, শীগগিরি উঠুন। অবাক কান্ড ঘটেছে। ওই মেয়েটা —'

'তার আবার কী হল ? এতক্ষণে তো তরতাজা হয়ে ওঠার কথা। নিয়ে এসো এখানে। ঠান্ডা লাগছে খুব, গা-টা একটু গরম করে নেওয়া যাবে।'

'না হুজুর, ও বেটী — ও বেটী পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!! কেন, তুমি দরজায় তালা দিয়ে রাখনি ?' শৈলেন্দ্র উঠে এসে জিজ্ঞাসা করে।

'হুজুর, এমন ভুল রাম সিং কখনো করতে পারে ? দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তালা দেওয়া থাকলে ও-ঘর থেকে পাখী হয়ে উড়ে না গেলে পালানো অসম্ভব। কিন্তু ও যে এমন ভাবে পালাবে — স্বপ্নেও ভাবিনি।' ভয়ার্ত শোনায় রাম সিং-এর গলা।

'আরে, কী হয়েছে পুরোটা খুলে বলবে তো! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'হুজুর, কী আর বলব! মেয়েটা বাথরুমের জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে। বাগানে ওর লাশ পড়ে আছে। চারতলার ওপর থেকে যে এভাবে ঝাঁপ দেওয়ার সাহস হবে ওর — একবারের জন্যও ভাবিনি।'

'কী! আত্ম — আত্ম —' কথা শেষ করতে পারেনা বিহ্বল শৈলেন্দ্র। শীতের মধ্যেও দরদর করে ঘামতে থাকে। হরীশ অবশ্য ঠান্ডামাথা। পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করে রাম সিং-এর হাতে গুঁজে বলল, 'যা বলছি মন দিয়ে শোনো। কেউ ঘুম থেকে ওঠার আগেই লাশ খামারবাড়ীর কোনো গোপন জায়গায় পুঁতে ফেল। তার ওপর কয়েকটা গাছটাছ পুঁতে দিও। আর হ্যাঁ — গর্তটা গভীর করে খুঁড়ো কিন্তু। আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। বাকী সব একটু সামলে নিও ভাই।'

'হুজুর, বাপের আমল থেকে আপনাদের বংশের নুন খেয়ে আসছি। ছিন্তা করবেন না — গাছের পাতাটিও জানতে পারবে না। আপনি শুধু দয়া করে তাড়াতাড়ি চলে যান।'

ওরা দুজনে প্রায় দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠেছিল সেদিন। ভোরের আলোয় শৈলেন্দ্র একবার তাকিয়েছিল বাগানের দিকে, যেখানে ফুলওয়ার নিথর দেহ ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। ভয়ে সারা শরীর কাঁপছিল ওর। অ্যাক্সিলারেটরে যত জোরে পারে চাপ দিয়ে এক ঝটকায় গাড়ী নিয়ে পালিয়েছিল সেখান থেকে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হরীশ বলল, 'ঐ দেহাতী ছুকরী এতটা ডেঞ্জারাস হবে ভাবিনি।'

'এখন ওর আত্মীয়স্বজন যদি জানতে পারে, তাহলেই আমাদের খেল খতম।' গভীর চিন্তিত শোনায় শৈলেন্দ্রর গলা।

'দূর, কী করে জানবে ? কাল ঐ রাস্তার ধারেকাছে কোনো জনমনিষ্যিই ছিলনা। তবে রাম সিং যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে অন্য কথা।'

'মনে তো হয় করবে না।' দাদাকে আশ্বাস দিতে গিয়ে নিজেই আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে শৈলেন্দ্র।

'ছাড় ওসব কথা। আচ্ছা শৈলু, শুনলাম সামনের মাসের দশ তারিখে নাকি তোর বিয়ের পাকাদেখা আর আশীর্বাদ ?'

'হুঁ, মাকে পুরুতমশাই তো ঐ ডেট্ই দিয়েছেন। আমি ভাবছিলাম, ঐ আদিবাসী মেয়েটা তো খুব গরীব। বলছিল মা-র জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছে। মা-টাও যদি মরে গিয়ে থাকে —' শৈলেন্দ্রর গলায় অনুতাপের সুর।

'ওঃ, শৈলু! ফর্ গড্স্ সেক্, ঐসব আজেবাজে কথা বলিস না। আমি এমনিতেই টেনশনে আছি। আরে, পিছনে ওটা কী আসছে দেখ তো! পুলিশের জীপ নাকি ?'

রিয়ারভিউ মিররে অনেক পিছনের সেই গাড়ীটাকে দেখে শৈলেন্দ্র গাড়ীর গতি আরো অনেকটা বাড়িয়ে দিল। হরীশ আশংকায় বলে উঠল, 'করছিস কী ? করছিস কী ? এতে তো আমাদের আরো সন্দেহ করবে। রিল্যাক্স্।'

শৈলেন্দ্র হর্ন না বাজিয়ে ঐ একই গতিতে সামনের ডানদিকের বাঁকটা নিতেই উল্টোদিক থেকে আসা আসা বিশালকায় ট্রাকে গিয়ে সোজা ধাক্কা মারল গাড়ী। তারপর — তারপর শৈলেন্দ্রর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতে যে কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে হল ওকে, তার চেয়ে মরে যাওয়াই হয়তো ভাল ছিল। হরীশ দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ও তো মুক্তি পেয়ে গেল, কিন্তু শৈলেন্দ্রর কোমরের নীচের অংশ এমন বিশ্রীভাবে থেঁতলে গিয়েছিল যে দুটো পা-ই হাঁটুর অনেকটা ওপর থেকে কেটে বাদ দিতে হল। এখনো কৃত্রিম পা লাগিয়ে চলাফেরা করার মতো জোর ওর দুই উরুতে নেই।

নিজের অজান্তেই বিছানায় সোজা হয়ে বসেছিল ও। মুখ দিয়ে অস্ফুট চীৎকারও বেরিয়েছিল একটা। রাম সিং শুনতে পেয়ে ছুটে এসে বলল, 'কী হয়েছে ভাইসাব ? মাথা ধরেছে ?' সম্ভবতঃ ওকে দুহাতে মাথা চেপে ধরতে দেখে রাম সিং-এর তাই মনে হয়েছিল।

'এক কাপ চা হবে, রাম সিং ?' ক্লান্তস্বরে প্রশ্ন করে ও।

'এখুনি আনছি ভাইসাব। পাঁচ মিনিটে নিয়ে আসছি।'

শৈলেন্দ্রর গলা শুনে মা-ও ছুটে এসেছিলেন। 'কী সুন্দর সকালটা, দেখেছিস শৈলু ? তুই তৈরী হয়ে নে, তারপর চল দুজনে মিলে খামারবাড়ীর আশপাশে একচক্কর ঘুরে আসি। রাতে ঘুম ভাল হয়েছিল তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ', মৃদুস্বরে বলে ও।

ভিখু এসে হুইল চেয়ারে বসাল ওকে। লনে পাতা টেবিলে চা-জলখাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল রাম সিং।

'রাম সিং, তাড়াতাড়ি বাজারে যাও মাছ আনতে। এখন গেলে টাটকা পাবে। শৈলু খুব ভালবাসে। আর এই চিঠিটাও ফেলে দিও ডাকবাক্সে, তোমার সাহেব ওদিকে চিন্তা করছেন।'

রাম সিং চলে যেতে মা ভিখুকে বললেন, 'ভাইসাবকে পুরো খামার ঘোরাবে। আগে ফলের বাগানের ওদিকটায় চলো। দেখি এবার ফলটল কেমন হয়েছে।'

'আচ্ছা মাঈজী। চলেন, দেখে খুশী হবেন', হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে একগাল হেসে জানায় ভিখু, 'এবার লিচুর ফলন ভাল হইচে, উপচে পড়তিচে। গেলবার এই খামারের পেঁপে এত মিঠে হয়েচিল যে বাজারে পড়তি পায়না।'

ফল দেখা হয়ে গেলে হুইল চেয়ার চলল খামারের সেই নির্জন কোণে, যেখানে একটা মহুয়া গাছ তার ফুলে ফুলে মাটিতে লাল-সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। হাওয়ায় তার মাদকতাময় সৌরভ ভুরভুর করছে।

'বাঃ ভিখু, বাঃ। ফার্মের এই কোণে মহুয়া লাগানোয় দারুণ দেখতে লাগছে তো ! কী সুন্দর ফুল। রোজ সকালে এই ফুল তুলে ভাইসাবের ঘরে সাজিয়ে রাখবে। ঘরে সুন্দর গন্ধ হবে। কী, ঠিক বলিনি শৈলু ?'

'মাইজী, রাম সিং তো বলে এ-গাছ ভাইসাব-ই শহর থেকে ওর হাত দিয়ে পেইঠ্যেচেন। ও কেবল পুঁতেচে।'

'কীরে শৈলু, তুই পাঠিয়েছিস এটা ? কোনোদিন জানতাম না তো আমার ছেলের এত বাগানের শখ !' বলে হাসিমুখে ছেলের দিকে তাকাতেই দেখলেন ছেলের মুখ পাংশুবর্ণ। কেমন একটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গাছটার দিকে।

'কী হল শৈলু ? কী হল ? ভিখু, ভাইসাবকে এখুনি ওর ঘরে নিয়ে যাও —'

ঘরে পৌঁছে বিছানায় নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে শৈলু। ঐ গাছটা — ঐ গাছটা কার স্পর্শ পেয়ে এত ফুল্লকুসুমিত, বুঝতে বাকী নেই ওর। যার লজ্জাবস্ত্র একদিন হরীশ একটানে খুলে নগ্ন করে দিয়েছিল, প্রকৃতি আজ পরম যত্নে তাকে মহুয়াফুলের চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। সেই চাদরের তলায় কী আজও ও ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে ? যদি তখন — যদি তখন মার পীড়াপিড়ীতে এখানে আসতে রাজী না হত, কী ভালই যে হত। এখন বাঁচার শক্তিটাও যেন মনে হচ্ছে কেউ নিংড়ে বার করে নিয়েছে। কোথায় গেল সেদিনের সেই পৌরুষের অহংকার, যার জোরে চোখের সামনে ঘটতে থাকা ধর্ষণের দৃশ্যকে উপভোগ করেছিল ও ? আজ এই পঙ্গু শরীর নিয়ে নপুংসক হয়ে পৃথিবীর ওপর একটা বোঝার মতো চেপে থাকা তো নিজের শবদেহ বয়ে বেড়াবারই সামিল। বন্ধ চোখের পাতাদুটো দিয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসে ওর।

মায়ের জোরাজোরিতে এক কাপ দুধ খেতেই হল। ছেলের কী কষ্ট, বুঝতে না পেরে মা ভীষণ বিচলিত হয়ে ছটফট করছেন। ছেলের মাথাটা আলতো করে নিজের কোলে রেখে মৃদুস্বরে হনুমান চল্লিশা পাঠ করতে থাকেন তিনি।

'মাইজী, এই দেকুন ফুল কুড়িয়ে এনেচি। কোতায় রাখব বলেন।' হাতভরতি লাল-সাদা ফুল নিয়ে শৈলেন্দ্রর শয্যাপার্শ্বে এসে দঁড়ায় ভিখু।

'ভাইসাবের মাথার পাশে টেবিলটায় রাখো।'

টেবিল থেকে কয়েকটা ফুল নিয়ে শৈলুর দিকে বাড়িয়ে দেন মা, 'দেখ বাবা দেখ, প্রকৃতিতে কী সুন্দর রঙের খেলা। লালের সঙ্গে সাদা কী অপূর্ব লাগে, তাই না ?'

মা তো আর জানতেন না, ছেলে তার মানসচক্ষে ফুল নয় — দেখছে একটা লালপাড় সাদা শাড়ী। কবে, কোথায়, কোন রাস্তার ধারে যেন ফুটেছিল ?

সহসা মার দুটো হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল শৈলু, 'ফেলে দাও ! ফেলে দাও ! তোমার পায়ে পড়ি। রক্ত গড়াচ্ছে — দেখছ না ? রক্ত, রক্ত ! বিছানার চাদরে রক্ত লেগে যাচ্ছে। সরাও, সরাও —'

ছেলের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আতংকের ছাপ দেখে মা-ও এবার আতংকিত।

'ভিখু, রামদীন, বনমালী ! তাড়াতাড়ি এসো, এক্ষুণি ডাক্তার ডাকো ! ভাইসাব — ভাইসাব কেমন করছে !'

ডাক্তার এলেও আর কোনো লাভ হত না। শুধু সদ্য পুত্রহারা মায়ের অশ্রু ঝরঝর করে পড়তে লাগল সেই লাল-সাদা ফুলগুলোর ওপর।

বিজ্ঞান (Science)

বুঝিবে সে কিসে

শাশ্বতী ভট্টাচার্য, ম্যাডিসন, উইস্কনসিন

সম্পাদিকা বলে দিয়েছেন, 'বিজ্ঞান চাই, কিন্তু দেখো ভায়া, বোধগম্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয় যেন' । ইন্টারনেটের সৌজন্যে পাওয়া একটা মর্মান্তিক চুটকী দিয়ে শুরু করি ।

একটা লোক অনেক দিন ধরে চুলকানির সমস্যায় ভুগতে ভুগতে শেষে বাড়ির সবার ঠেলাঠেলিতে এলাকার এক ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে রাজী হলো ।

ডাক্তার রোগীর রোগের ইতিহাস শুনে অনেকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে একটা বড়ো শিশির ওষুধ দিলেন, 'রোজ স্নানের সময় দুই হাতের আঙ্গুলে ভালো করে মাসাজ করবেন' ।

রোগী খুশি হয়ে বলল, 'তাতেই আমার চুলকানি চিরতরে সেরে যাবে ? আশ্চর্য, সায়ান্স কি উন্নতি করেছে !' ।

ডাক্তার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, এটা ঠিক চুলকানি সারার ওষুধ নয়' ।

রোগী অবাক, 'এটা চুলকানি সারার ওষুধ না তো এটা কিসের ওষুধ ? আমায় দিলেন কেন ?'

ডাক্তার আগের মতই গম্ভীর, 'এই ওষুধটা আমি দিয়েছি আপনার নখ বড় হওয়ার জন্য, যাতে চুলকিয়ে আরাম পান' (১) ।

হায় ! বুঝিবে সে কিসে, কি যন্ত্রণা বিষে, কভু আইভিলতা স্পর্শেনি যারে, কভু মশক কুলে দংশেনি যারে ।

এই চুটকিটার সূত্র ধরে এক বন্ধু আমায় বলেন, ''কি বিজ্ঞান বিজ্ঞান করো ? চুলকানি সারানোর একটা ওষুধ আবিস্কার করতে পারলে না, চাঁদে গিয়ে কি লাভ হলো, তার চাইতে বরং . . . . . '' ।

চুলকানি আর আঁচড়ানো, ইংরাজী প্রতি শব্দ ইচ (Itch) আর স্ক্রাচ (Scratch) । মাঝেসাজেই চুলকানোর জায়গাটা নাগালের বাইরে থাকে । তখন মাসি, পিসী, যাকে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তার কাছে কাতর অনুনয়, 'এই একটু চুলকে দাও না ! না না হচ্ছে না, আট্টু বাঁ, না না ডান . . ., হ্যাঁ হ্যাঁ । বেশ ভালো করে . . ., উফ্ তখন থেকে খুঁজছি তোমায় ! কোথায় যে থাকো' ।

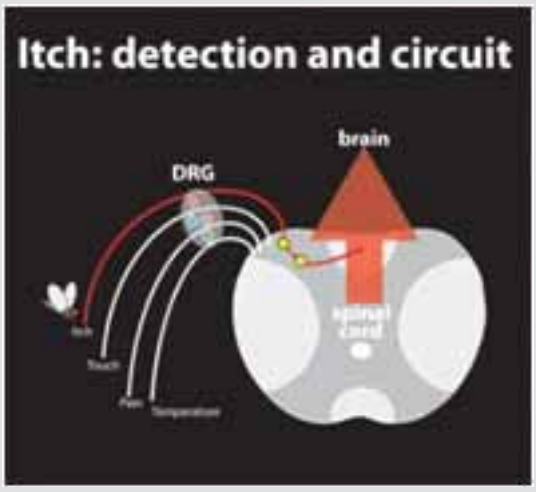

দরকার পড়লে পেন, পেনসিল, লোহার শিক, উলের কাঁটা তো আছেই । নখের আকারে একটা প্লাস্টিকের রডও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় । জাংগল বুকের ভালুকে মনে আছে ? চোখ বন্ধ করে ইয়া-বড়ো এক গাছের কান্ডে নিজের পিঠটাকে উপর নীচে ঘষে তার মুখের হাসি ? কেন বা কি এই অনুভূতি, যাকে দমানোর জন্য নিজেরই শরীরের কোন একটা কেন্দ্রে আঘাত করে, লাভকরি দারুণ এক পরিতৃপ্তি ?

ইংরাজী প্রুরাইটিক রেস্পন্স (pruritic response), দুটো কাজকে একত্র করলে যা দাঁড়ায়, তার ডাক্তারী নাম । প্রথমটা একটা অনুভূতি, চামড়ারও পর থেকে যার যাত্রা শুরু, ট্রেনের এক কামরা

থেকে অন্য কামরা যাওয়ার মতো সেই অনুভূতির বার্তা পৌঁছাবে, ট্রেনের ইঞ্জিনে, ব্রেন বা মগজে। তড়িঘড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রেন তখন পাঠাবে হাতকে, 'এ্যাকশান ! উপর-তলা থেকে হুকুম এসেছে, এখনই চামড়ার ওপর নখ বা তীক্ষ্ণ কিছুর ছোঁয়া চাই'। সুরসুরিটা ওরফে ইচটা কে সামাল দেওয়ার জন্য একটা কিছু কাজ করা হলো, আঁচড়ানোটা সেই রেস্পন্স।

মনে রাখতে হবে যদি এতোসব কান্ডকারখানার পর শেষমেষ আনন্দানুভূতির একটা বড়োসড়ো পারিতোষিক না থাকতো, ওই আঁচড়ানোর কাজটা করতে আমরা যেতামই না। তার সব ভালো যার শেষ ভালো।

পাঠক ঠিক ধরেছেন, আমি বিবর্তনের দোহাই পাড়তে চলেছি, তবে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার তাগিদে শুধু-মাত্র মানুষের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবো, ভালুর কথা আর তুলবো না।

গড়পড়তা মানুষের দেহে রয়েছে প্রায় কুড়ি স্কোয়ার ফিট চামড়া (২)। বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ফুসফুস, কিডনী, যকৃত, জঠর ইত্যাদিকে আড়ালকরা মস্ত একটা আচ্ছাদন। বাইরের পৃথিবীর সূর্যের ছটা, বৃষ্টি জলের ঝাপটা, হাওয়া, লক্ষ লক্ষ ভেসে বেড়ানো ধুলোর কণা, ফুলের পরাগ, জীবানু, বিজাণু ইত্যাদি থেকে ভিতরের সব অঙ্গসমূহকে রক্ষা করে রেখেছে এই চামড়া। ঠিক যেন বর্ম, অথচ বয়ে বেড়াতে অসুবিধে নেই ! এমন হালকা এটা আচ্ছাদনের অস্তিত্ব আদৌ যে আছে, সারাদিনে আমরা কয়বার সেটা ভাবি ? কচ্ছপ বা শামুকের পরিস্থিতিটা একবার ভেবে দেখুন পাঠক।

কিন্তু চামড়া শুধুমাত্র আচ্ছাদনই তো নয়, বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রাথমিক প্রবেশদ্বারও বটে এবং সেই জন্যেই প্রাণ-ধারণের জন্য অপরিহার্য। অতএব এই কুড়ি স্কোয়ার ফিট চামড়ার প্রতিটি ইঞ্চিকে ঠিকঠাক রাখাটাও একান্ত জরুরী। ঘটনা চক্রে এই চুলকানো এবং আঁচড়ানোর মতো সহজ (কিম্বা কঠিন) যৌথ কাজটা সেই তাড়নায় বিবর্তিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

এইটুকু বললেই হয়তো কাজ মিটে যেতে পারতো, কিন্তু প্রুরাইটিক রেস্পন্স নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসে আলোচনাকে ভাসা ভাসা, অগভীর ইংরাজীতে যাকে বলে স্কিনডিপ (skin deep) রাখলে চলবে কেন ?

পাঠককে মনে করিয়ে দিই আমাদের শরীর ঢাকা জলজ্যন্ত এই চাদরটা কিন্তু তিন-তিনটে পরতের বেশ জম্পেশ একটা আচ্ছাদন (৩)। সব চাইতে ওপরের আস্তরণ এপিডারমিসের উপরে স্বাভাবিক ভাবেই ঝড়ঝাপটা সব থেকে বেশী, আবার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এপিডারমিস (epidermis) কোথাও ঠাস বুনুন কোথাও বা আবার ফিনফিনে পাতলা। শীতের দিনে ফাটা পায়ের সাথে যাদের পরিচিতি আছে, তারা জানেন, পায়ের পাতার নীচে গোড়ালীর ধার থেকে মোটা চামড়ার টুকরোটাকে ফরফর করে বাঁধাকপির সব থেকে ওপরের পাতার মতো ছিঁড়ে ফেলতে কোন অসুবিধে হয় না। মামুলি ছড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে সেরে যাবে। এই পরত কিছুদিনের মধ্যেই নতুন কোষ দিয়ে আবার ভরাট হয়ে যাবে।

এর পরের পর্দা ড্যারমিস (Dermis)। এপিডারমিসের অনুপাতে দৈর্ঘে অনেকটা বেশী এই ''রোমাঞ্চকর'' পরতের মেলা কাজ। ঘাম আর রক্ত এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। ভয় বা অনুভূতির প্রভাবে রোমকে যখন সটান দাঁড়িয়ে পড়তে দেখি তার জন্য দায়ী রোমের শিকড় সম্বলিত ছোট ছোট পেশী এবং ড্যারমিসে অবস্থিত নার্ভ এন্ডিং (nerve ending)। নদী যেমন এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে মেশে, এই ড্যারমিসে এসেই থেমেছে আমাদের শরীরের সমস্ত নার্ভ। অতএব, ব্রেন বা মগজ থেকে আসা সিগন্যাল যেমন এই ড্যারমিসের কাছেই আসছে, আবার বাইরের পৃথিবীর যাবতীয় খবরাখবর এই ড্যরমিসের মারফতই যাচ্ছে মগজের কাছে। এর পরের তবক সাবকিউটেনাস ফ্যাট (Subcutaneous fat)। নামটা শুনতে একটু বাজে লাগলেও এই পরতটাই কিন্তু ঠান্ডার সময়ে শরীরকে গরম রাখে। এটা কে ড্যারমিসের সাথে শরীরের সংযোজক অংশ বলা চলে, কেননা এইখানে আছে এমন বিশেষ কিছু কোষের গোষ্ঠি (ওরফে টিস্যু) যেটা ড্যারমিসকে হাড় (Bone) বা পেশী (muscle) এর সাথে যুক্ত করে রেখেছে। তাছাড়া ড্যারমিস থেকে আসা রক্ত-নালী এবং নার্ভ এই পরতে এসেই পরিধিতে বৃদ্ধি পায়।

আমাদের আলোচনা এই দুই ধারে দুই কলাগাছ, মধ্যে খানে মহারাজ ড্যারমিসটিকে নিয়ে। আগেই বলেছি এই মহারাজটি নার্ভ নদীর সমুদ্র।

পাঠক, কথা দিলাম সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার আগে, আপনার জন্য ডিঙ্গির যোগাড় করে দেবো। তার আগে চট করে দেখে নিই, কি ভাবে হেড অফিস, (পড়ুন ব্রেন) উদ্দীপকের (ইং stimulus স্টিমুলাস) সাথে মোকাবিলা করে।

কল্পনা করুন বেলা শেষ। কাজের শেষে, চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে আপনি বাইরের বারান্দায়, বসেছেন বেশ মৌজ করে, আর এক বেটা মশা একটুকুন ফাঁকা চামড়া পেয়ে হাউ মাউ খাউ; দিয়েছে এক কামড়।

আমাদের জানা আছে মশার মুখে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মতো লম্বা এক নালি আছে। আমাদের ধারণা সুযোগ পেলেই সেই নালিটার মাধ্যমে শরীরের রক্ত-নালীর স্রোত থেকে রক্ত শুষে নেওয়াটাই মশার অভিপ্রায়। অধিকাংশ সময়েই মশা-বাবাজী সেই অভিযানে সফল হন না (কেন না তার আগেই চপেটাঘাতে মৃত্যু বরণ করে নিতে হয় তাকে) তবে ওই যে . . ., ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা ড্যারমিস অবধি এসেছে তাতেই বিরক্ত উত্যক্ত হয়ে উঠবে ড্যারমিসে অবস্থিত বিশেষ প্রকারের রেসেপ্টার (receptor) প্রোটিনের দল।

বলাবাহুল্য এই বার্তা যাকে দিলে কাজ হবে সেটা হলো হেড অফিস। অতএব ড্যারমিসে শুরু হওয়া বার্তা একটি নার্ভ থেকে অন্য নার্ভ, তার পরে স্পাইনাল কর্ড-এর মেট্রো রেল ধরে পৌঁছে যাবে ব্রেনের সেরিব্রাল করটেক্স (cerebral cortex) নামক এক কেন্দ্রে। ব্রেন সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে যা করতে হুকুম দেবে ঠিক একই ভাবে উল্টোদিকে স্পাইনাল কর্ড হয়ে এক নার্ভ থেকে অন্য নার্ভ বেয়ে এসে পৌঁছে যাবে আপনার আঙ্গুলের ডগায়, খচাখচ খচখচ করে খানিকটা চুলকিয়ে নিয়ে আবার চায়ের কাপে চুমুক দেবেন আপনি; বাবাহ্ যা মশা এখানে।

আমাদের স্পাইন্যাল কর্ডে অবস্থিত যে জীন (Gene) এই কাজটা করতে আপনাকে বাধ্য করছে তার বাহারী নামটা হলো gastrin-releasing peptide receptor অরফে জিয়ারপি আর (GRPR)। জীনটার নামটা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এখানে কিছু মোচন বা রিলিজ করার কথা বলা হচ্ছে। তার কারণ এই যে বার্তার কথা লিখলাম পরমাণুবিক স্তরে তো আসলে কতোগুলো রাসায়নীক পদার্থের নিঃসরণ যাদেরকে আমরা ডাকি নিউরোট্রান্সমিটার নামে।

যে নার্ভ কোষ গুলো এই নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ায় অংশ গ্রহন করে তারা নিউরণ (Neuron)। একটি নার্ভ কোষ যেখানে অন্য একটি নার্ভ কোষের সাথে মেশে সেই অংশটুকুর নাম সাইনাপ্স (synapse)। এই সাইনাপ্সে এসেই নিঃসারিত রাসায়নিক নিউরোট্রান্সমিটারটি চালান হয়ে যায় অন্য নার্ভের পরিধির মধ্যে।

প্রসঙ্গত, ড্যারমিসের স্তরে রেস্পেটার এবং নিউরণ নিঃসৃত নিউরোট্রান্সমিটারের কার্যকলাপের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা লঙ্কার জ্বালা টের পাই, গরম ইস্তিরীতে হাত পড়ে ছিটকে সরে আসি, সূঁচ ফুটে গেলে হাত সরিয়ে নিয়ে ‘‘উফ মাগো’’ বলে উঠি। তাই বেশ বহুদিন ধরে বিজ্ঞানী মহলের বিশ্বাস ছিলো চুলকানোর অনুভূতিটাও যন্ত্রণার (pain) মতোই আরেকটি অনুভূতি; শুধু প্রবলতার নিরিখে যন্ত্রণার চাইতে লঘুতর (৪)।

প্রসঙ্গত, টিয়ারপিভি নামক একটি ছোট আকারের প্রোটিন (অরফে পেপ্টাইড) নিঃসরণ করার মাধ্যমে ড্যারমিসে অবস্থিত নার্ভ কোষগুলি গরম ছ্যাকা, চিমটি কাটার ব্যথা কিম্বা মশার চুলকানীতে সাড়া দেয়, অর্থাৎ নার্ভ থেকে নার্ভবার্তা প্রেরণ করে ব্রেন অবধি নিয়ে যায়। যৌথভাবে এদের টিয়ারপিভি একপ্রেসিং নিউরণ (TRPV1-expressing neurons) নামে ডাকা হয়।

২০১৩ সালে, ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ ডেন্টাল অ্যান্ড ক্রেনিওফেসিয়াল রিসার্চের (National Institute of Dental and Craniofacial Research) ল্যাবোরেটরি অফ সেন্সরী বায়োলজীর (Laboratory of Sensory Biology) গবেষক ডঃ সন্তোষ মিশ্র এবং হুনমা এই ধারণায় এক নতুন চমক এনে দিলেন (৫)। এদের কাজের সুত্র ধরে এই ব্যথা-সুরসুরি-আঁচড়-চুলকানীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো দুইটি নতুন খেলোয়াড়। দাতা নিউরোট্রান্সমিটার এবং গ্রহিতা রেস্পেটরের নাম যথাক্রমে ন্যাট্রউরোটিক পলিপেপ্টাইড বি natriuretic polypeptide b) এবং ন্যাট্রউরেটিক পেপ্টাইড রেস্পেটর এ (natriuretic peptide receptor a)। মিশ্র এবং মা দেখালেন যে চুলকানীর অনুভূতিকে ব্রেনে নিয়ে

যাওয়ার কাজটা হয় এই নির্দিষ্ট দাতা এবং গ্রহীতার মাধ্যমে, এবং কিছু বিশিষ্ট টিয়ারপিভি এক্সপ্রেসিং নিউরণ এই স্পেশাল দুটি জুটিকে বহন করে। শুধু এদের পক্ষেই চুলকানোর বার্তাকে মস্তিস্ক অবধি বহন করা সম্ভব।

নতুন এই তথ্যটাকে জোরদার করার জন্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ইঁদুরের শরীর থেকে এই বিশিষ্ট দাতা গ্রহীতার জোড় বহন করা বিশিষ্ট নিউরণগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এই গবেষকেরা দেখালেন যে ইঁদুর গুলি ব্যথা বা গরমের অনুভুতিতে সাড়া দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু চুলকানোতে নয়। এই প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখ যোগ্য তথ্য হলো ন্যাট্রউরোটিক পলিপেপ্টাইড বি নামক পরমাণুটা হার্টের কোষে থেকেও নির্গত হয়, সেখানে তার কাজ রক্তের সোডিয়াম আর প্রেসার মাপা।

আর চুলকানোর আরাম-টা ? সেটার জন্য আরেক নিউরোট্রান্সমিটার, যার নাম হয় তো শুনে থাকবেন। হ্যাঁ সেটা সেরোটোনিন (serotonin)। এই নিউরোট্রান্সমিটারের কাজই হলো ব্যথার অনুভুতিটাকে দমিয়ে ফেলা, যার ফলে নখের আঁচড়ে আপনার ব্যথা তো লাগলোই না, উল্টে আরাম পেলেন।

অতএব, বৈজ্ঞানীকেরা এই চুলকানো নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে আছেন, তারা না পারেন সেরোটোনিনকে কমাতে, না পারেন অসুধ দিয়ে ন্যাট্রউরোটিক পলিপেপ্টাইড বি কে হটাতে।

কোন এক জ্ঞানী মহাপুরুষের মন্তব্য অনুসারে বলি ফোড়াটা বেশ টু ইন ওয়ান, দেখিয়ে ভিক্ষা যেমন চাওয়া যায়, আবার চুলকিয়ে আরাম পাওয়া যায়।

তাহলে উপায় ?

এক — দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন চুলকিয়ে যেন কেউ ঘা না করে। দুই — হাতের নখ বড়ো করুন। এক সাথে শত্রু আর চুলকানোর মোকাবিলা করা যাবে।

দ্রষ্টব্য

১। http://bdjokes.com/author/yasin/

২। Wilkinson, P. F. Millington, R. (2009). Skin (Digitally printed version ed.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 39-50.

৩। http://www.aad.org/public/kids/skin/the-layers-of-your-skin

৪। Sun Y. G. et al. Cellular basis of itec sensation Science 2009 Sep. 18; 325 (5947): 1531-4.

৫। Misra S. K. & Hoon M. A. The cells and circuitry for itch responses in mice. Science. 2013 340(6135):968-71.

শাশ্বতী যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। কেমেষ্ট্রিতে মাস্টার্স ডিগ্রী করে সি এস আই আর (CSIR) এর স্কলারশীপে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটুট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজিতে পি এইচ ডি র কাজ করেছেন। মেরিলান্ডের ন্যশানাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে পোস্ট ডঃ করে এখন ইউনিভার্সিটি অফ উইস্কনসিন ম্যাডিসনে সায়েন্টিস্ট। ওর নিজের ভাষায় ''ব্রেস্ট ক্যান্সার গবেষণায় ব্যস্ত আছি, স্বস্তি নেই। আনন্দ আছে কিন্তু প্রফুল্লতা নেই।'' ওর জীবনের অল্প কয়েকটা আফসোসের একটা হল, সায়ন্সকে জীবিকা নির্বাহ করার উপায় অবলম্বন করায় ওর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজটা একটুর জন্য হাত ছাড়া হয়ে গেলো।

Editorial

Is peace a place we can go to or something we create within ourselves? Do we find peace in the familiar: time relaxing with family and friends? Do we need to risk and push our boundaries to renew ourselves, traveling to other places, meeting and learning to understand people with completely different life experiences? What makes us whole and gives us renewal?

This March issue of *Batayan* features stories of personal hope and dreams for freedom and peace in society. In *A Glorious Defeat: History of the INA*, Anjan Roy shares the history of freedom fighter Subhas Chandra Bose, respectfully called 'Netaji', struggling for India's liberty during World War II. In *A Journey With No Return*, Mohan S. Kharbanda shares a family history of separation and perseverance during the partition of India and Pakistan. Carla Jankowski and Kathy Powers stretch the boundaries of their lives and hopes in *Book Worlds* and *Is This Bliss?* respectively. *Vasanta* by Souvik Dutta shows the divine and natural beauty of spring in Bengal. We wish you a happy spring and hope this issue of *Batayan* renews your spirit.

Jill Charles
English Editor

Vasanta

Souvik Dutta, Chicago, IL

ललितलवङ्गलतापरिषीलनकोमलमलयसमीरे।
lalitalavaṅgalatāpariśīlanakomalamalayasamīre |
मधुकरनिकरम्बितकोकिलकूजितकुञ्जकुटीरे।
madhukaranikarakarambitakokilakūjitakuñjakuṭīre |
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते।
viharati haririha sarasavasante |
नृत्यति युवतिजनेन समम् सखि
nṛtyati yuvatijanena samam sakhi
विरहिजनस्य दुरन्ते धृवम्।।
virahijanasya durante - dhṛvam ||

~ Chapter 3 Verse 1 of Jayadeva's Geeta Govindam, Raag Vasantam

In this Vasant (spring) the gentle vernal breezes from mountain peaks of Malaya flirt with the slim tendrils of the clove trees in the valley. The breezes carry the fragrance of sandalwood from the mountains and mingle with the delightful fragrance of the cloves spreading the fragrance of both all around.

In this Vasanta the bowery cabins come to life with the intermingled buzz of honeybees' swarms and croons of "kokila" throngs. The union of these sweet sounds creates a union that lives around the region.

In this season of union of smell and sound, in this season of creation, in this Vasanta, the Krishna you seek is gloriously frolicking and dancing with his young "sakhis" in Vrindavan right at this moment, for this is Vasanta, isn't it?

Let us all go to meet our Krishna all of us who are lovelorn because it is Vasanta, it is the time of union.

Spring has a special place in our hearts. It symbolizes creation, beginning, renewal and love. Ancient sages have always associated festivals with seasons so that the spirit of the season can be remembered by humanity.

Hindus have six seasons and based on regional classifications each season is allotted certain months. Bengalis have mapped the seasons to months as detailed below:

Bengali Month	**Ritu**
Boishakh, Joishtho	গ্রীষ্মকাল (Summer)
Asharh, Srabon	বর্ষাকাল (Monsoon)
Bhadro, Ashwin	শরৎকাল (Antumn)
Kartik, Ogrohayon	হেমন্তকাল (Late Autumn)
Poush, Magh	শীতকাল (Winter)
Falgun, Choitro	বসন্তকাল (Spring)

Phalgun & Chaitra these two months which form the season Vasanta have always fascinated the creative minds of the sages. Phalgun is said to begin after the last new moon (Amavasya) of Magh giving way to the new beginning of spring.

The night before the Amavasya of Magh is called Magh Caturdashi also known and celebrated as Mahashivaratri. Shiva, detached and uninterested in interacting with the world, sits atop the snow clad Kailash. He is dry uninteresting winter. Shakti as Prakriti entices him, melts the snow around him, and requests him to unite with her. She is Basanti, the personification of spring. Purush (as Shiva) unites with Prakriti (as Shakti) to take the world from the detachment of winter to the attachment of spring.

The most important way to remember Vasanta is through color. The dryness of winter disappears as nature rejoices with life, with vitality and with color. This message of spring is celebrated by the fun festival of Holi on the full moon of Phalgun. The celebration of Holi has strong ties to both Vasanta and the love of Radha and Krishna. As per folklore, in his youth, Krishna despaired that the fair-skinned Radha would ever like him despite his dark skin. Yashoda, with light laughter, asked Krishna to approach Radha and color her face so that she would also be colored like him. This Krishna did playfully and thus began the celebration of Holi on the full moon of Phalgun.

As the new moon of Phalgun gives way to the month of Chaitra, the spirit of Vasanta is reinforced by the celebration of Chaitra Navaratri also called Basanti pujo. The goddess who is Prakriti personified is worshiped as a girl who is about to reach puberty, as a daughter and as a would-be mother. The message of fertility of nature and dependency of man on Prakriti is reinforced in the worship of the divine feminine in the month of Chaitra.

The divine epic of Ramayana comes to life in Chaitra month when Rama Navami and Hanuman Jayanti are celebrated in the same month.

The message of Vasanta is renewal, love and passion. Longing of love is not possible without separation and thus Vasanta also celebrates Ram whose separation from Sita only makes his love for her stronger. The reparation of Krishna and Radha only leads to the increased passion they have for each other. Vasanta is just not the season for the happy union kind of love; it is the season for every kind of love, even the one for which the lovelorn Radha rushes to Vrindavan to dance with Krishna.

As Jayadev so brilliantly wrote in Geeta Govindam, Vasanata is the season of union. Neither the separation of winter nor the aggression of summer stands a chance in this season. It is a season that is kind, playful and cares about the other, not just the self. Let us see through the message of the sages hidden in the beautiful festivals of Vasanta and live it through our lives.

The Proposal

Samrat Bose, Ilford, UK

It was getting colder as the evening wore on. Krish barely noticed the draft as he walked briskly towards the front of the museum. His mind was in a whirl but despite the apparent ruffled state of his mind, he was clear about one thing. He had to reach the serpentine steps that led to the portrait gallery. He had frequented this place quite a few times in the past. An ardent art lover, he had time and again marvelled at the different exhibitions that this place hosted, many of which he could illafford to attend. Sometimes it was his work while at other times the steep prices kept him away. He had managed to attend a couple which featured artists who had always fascinated him.

Only this time, it was a different occasion and fascination was not quite the word to describe his emotions. He passed by office goers trying to outpace him on their way home on this chilly evening. Doubtless many of them had spent the day in some cosy environment, protected by insulated windows and artificial heating. Now thrown into the chill before they entered their warm homes again, they grasped their overcoats and jackets as they rushed in hoards towards the underground stations and bus stops.

Krish took a final right turn and reached the front of the huge building. There were tall pillars that made up the front, supporting a large domelike structure at the top. It reminded him of some of those Italian buildings from the renaissance; but that was where any hint of resemblance stopped. He looked at his watch. There was still time to watch the crowds before he made that phone call.

It had all started with a phone call, actually. Three years to the day, he had made that phone call, although by mistake. He thought he had called a friend but had actually dialled the name above. Smartphones are smart for certain things, but not enough to read minds. He therefore got the shock of his life when a woman's voice came through. The voice was familiar enough to open a deluge of memories, though he remembered how he had tried to keep any excitement in his tone at bay. He had paused a few seconds, not answering the repeated hellos from the other end and had snapped out of his reverie just in time. “Is that you, Nandita?” he had asked.

That single question did not quite so much come from his instant recognition that he had mis-dialled. In fact, he was spellbound at how fast the mind works; how quickly he had travelled the thousand and one images in his mind from years ago. Thinking back, he later realised that it had been thirty years since he had last heard her voice. The initial teenage hesitation had been replaced with the initial mature confidence, but as she gradually realised who was calling, the hesitation returned. It then gave way to familiarity and finally to resigned laughter before they bade goodbye that day, much like how things had unfolded so many years ago.

They had discussed this and that and about life in general. All through the conversation, there was this constant between the lines urge to know that one information about the other person. Finally, they both acknowledged this and on Krish's comment that sometimes on tired days he bothers not to cook because no one else would be inconvenienced, she agreed how it is best to

self-manage one's affairs without assistance or interference from anyone else. Relieved at last, they had laughed heartily after a momentary pause.

Thereafter, through life's twists and turns, they had kept in touch. Sometimes they did not talk for long periods, though occasional messages kept them abreast of each other. Sometimes they lost touch altogether, but rested assured that it would be just a message or a phone call to restart things again. That is, if things needed another restart.

And so it was after one of those longish pauses that he had called her up and said that he would like to speak to her again later at some predetermined hour. This evening was the evening and unknown to her, he was again on his way to another exhibition and he wanted to speak to her before he entered the museum.

He looked at his watch again. It had started to turn just that little darker. Dusk. Yes, that was the word for it. The sun had officially set, though there were the last of its rays visible in a last ditch attempt to light the world before darkness took over. It was almost some sort of a reminder that it would still be there the next morning, though Krish could not be entirely sure. The wind was now gathering pace and all of a sudden, the number of people around him had considerably lessened.

It took a few rings before she picked up the phone. "Sorry, was at the door," she said.

"That's all right," said he, "you've always been the social type, remember?"

"Social, my foot. It was the delivery man but with the wrong address." He smiled. "Guess what?"

"What?"

"I'm calling you from the same spot I called you from when we reconnected. I knew I would be coming here, so couldn't help."

She paused for an instant. He could almost imagine her face but could not fathom if she thought this was rather sweet or whether there was an expression of resignation, much like what some of Picasso's models may have had when they saw their portraits.

"Wow!" she said, much to Krish's relief. "That's incredible. that's actually so…" she broke off.

"Sorry, did not quite catch you there," said Krish, yearning to hear what she wanted to say.

She seemed to pause for a second or two. "That's so nice," came her voice again.

They talked about this and that. Krish wanted the moment to be still, absolutely still. He was anxious, however, that his own eagerness did not shine through too much. He was happy to leave all that shining to the sun, which, despite all its promises of a new dawn was actually sinking.

The streetlights had come on and the passers byes had become less still. The street artists and acrobats who earned their livelihood in front of the gallery had more or less gone and the last one was counting his days earnings. A few pigeons soared overhead and made their way to some ledge of one of the nearby buildings. Apart from the cars and buses in the distance, the streets were less lively than even half an hour ago. The draft had become colder with time and Krish drew himself together as he sat on the stairs making the call. Their conversation had petered to long pauses and few words.

"I…I wanted to ask you something, Nandita," said Krish.

"What is it?"

"Nandita, will you marry me?"

There it was. Abrupt, but it was done. He had no romantic lines to say, no flowers to give or chocolates to share today. But he knew he would not be able to return home without knowing one way or the other. They were miles apart, two souls, without having met for thirty years. She knew him as one awkward teenager while for him she was the one who had been the first to fascinate him.

After what seemed like an eternal pause, came her reply. Krish listened like he had never listened before, fascinated. Her voice, like always, carried the jingle regardless of what she said and her laughter was always infectious.

Krish laughed. The wind blew harder and somewhere close by, a million leaves fell in a silent applause. Krish, with his phone set close to his ear, started to walk towards home.

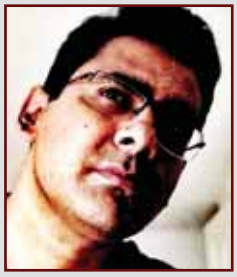

A curious study in contrasts, Samrat pursues pixels, paintbrushes, prose and poetry. Influenced by the surrealist and cubist art movements, he finds his inspiration in the random micro-moments of the macrocosm. He is someone in pursuit of an unknown mission, dabbling here and there and hoping he never finds it, for that would end this wonderful journey.

A Glorious Defeat

Anjan Roy, Chicago, IL

[Not many North Americans know that a large number of the Indian population had taken up arms in South East Asia to free India from the British rule and the man who spearheaded that movement, many consider him the "George Washington of India", was Subhas Chandra Bose, respectfully called 'Netaji' (the revered leader). American Historian Professor Peter Ward Fay wrote:

> "Halfway through the Second World War there appeared quite unexpectedly in South East Asia an army, an Indian army; an army with an adored and indomitable leader by training not a military man at all; an army that using Malaya as a base, Burma as a launching pad, and Japan as a helpmate, tried - even as the war in that part of the world wound up towards its by then inevitable close - to throw the British out of India."

Ironically, the contribution made by that army to the cause of India's independence has not been recognized. Although its efforts failed, it has been established by many Western Historians that this Army, known as the Azad Hind Fauj or Indian National Army, left a long lasting influence on the Indian population, particularly on the British-Indian Army. History says that the British Administration became worried with the changing political situation in India as the public sympathy towards the INA soldiers and the INA's influence on the Indian servicemen in the British Army grew steadily after 1945. The reason for which the British hurried to transfer power and leave India could be found in this Official Memorandum sent to the Viceroy of India by Sir Henry Twynam, Governor of Central Provinces:

> "I am bound to say that I do feel some uneasiness as to the attitude which Indian troops may adopt if called upon to fire on mobs. The disposition towards a sudden change of attitude in a tense political atmosphere is present now, I think, as it was in the days of the Mutiny."

With the aforementioned prelude, I tried to tell the story of the beginning of the end of the INA and how it influenced the British's decision to quit India, in a very brief way possible. The names Bose and Netaji are synonymous]

By the end of February, 1945 it became apparent that the Indian National Army's (INA) efforts to enter Imphal from Burma and move deep into India had failed and it also became obvious that the Japanese could not hold on to Burma much longer because of the rejuvenated British-Indian army's advancement with American assistance. But INA's Netaji Subhas Chandra Bose did not want to retreat from Burma, he ought to go to Mount Popa, a steep, isolated 5000-foot mountain instead, where one of his most trusted men Lieutenant Colonel Prem Kumar Sahgal of the INA's 2nd Division was camped. Bose's only wish was to 'fight the British unto death.' Hugh Toye wrote: "he would lead the INA to victory or death," as he had promised his troops that he would be with them "in darkness and in sunshine, in sorrow and in joy, in suffering and in victory."

Bose was in Meiktila in Western Burma at that time and his fellow officers were vehemently opposed to his going to Mount Popa. British-American bombers were bombing the area heavily. But Bose was adamant. Hugh Toye wrote: his motivation was: "his soldiers must create such a

legend of heroism and determination that their countrymen could be inspired to raise the banner of revolution again in India." At one point Lieutenant Colonel Shah Nawaz lost his patience, he told Bose: "you are proposing to risk your life," he said, in effect, "just to show your personal courage, but this is selfless and you have no rights to do it; your life is not your own, it is a precious trust for India, held in our keeping: we are responsible."

Not only non-stop bombing by the allied airplanes, the INA's fighting forces faced with multifaceted problems such as, shortage of arms and ammunition, paucity of food, clothes and shoes, communication and medical equipment, medicines and above all non-cooperation from the withdrawing Japanese. Many of the INA soldiers became sick of malaria, diarrhea and other ailments. And there were the problems of desertions. Bose was devastated with the news of daily desertions by his soldiers and officers and their surrender to the British. Bose ordered shoot at sight for the deserters and arranged evacuation of sick and injured soldiers. He also ordered evacuation of the women of the Rani Jhansi regiment for them to return to their parents. A report came that an advancing British-Indian armored column came only 16 miles of Meiktila. Bose agreed to get away if he could to Pyinmana (on way to Rangoon and eventually to Singapore). The sky was full of enemy planes and the villages of British spies. Shah Nawaz wrote:

> "I filled up the car with grenades and ammunition.... When we entered the car and started off [at about 9 a.m.] Netaji was sitting with a loaded Tommy gun in his lap. Raju [Bose's doctor] had two hand grenades ready. The Japanese officer was holding another Tommy gun and I had a loaded Bren.... We all were ready to open fire instantaneously. The Japanese officer stood on the foot-board of the car to be on the look out for enemy aircraft."

Netaji returned to Rangoon on March 2, after receiving the news of daily desertions. Nevertheless, the brave INA soldiers fought bravely here and there, but most of them died or taken prisoners. Shah Nawaz had returned to the front. It may be noted here that Prem Kumar Sahgal surrendered in Mount Popa on April 4, 1945. Shah Nawaz and Gurbaksh Singh Dhillion were captured near Pegu on May 13, 1945.

On April 24, 1945 Netaji set off from Rangoon by road on way to Siam (Thailand) and Malaya with a large contingent of INA officials and the women of the Rani Jhansi Regiment. Major-General A. D. Loganathan was left to preside over the INA surrender in Rangoon with 5000 soldiers. Netaji arrived Siam on May 21, 1945. It was an arduous and dangerous journey, marching mainly under the darkness at night on foot and partly by train to avoid enemy bombing. He had offered Captain Lakshmi Swaminathan to come with his team, but she refused to leave Burma. She was eventually captured while hiding in a Gurkha village near Mawchi in early May 1945.

Upon arrival in Singapore, the Azad Hind Government's cabinet met frequently to discuss future options of its very existence including the future of its Netaji. There was no doubt in anybody's mind that the British agents were looking for Netaji, dead or alive. In the mean time the Americans dropped Atom Bomb in Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 9, 1945 respectively. On August 10 Japan declared its intention to surrender, which it did and on August 15, 1945. The USSR declared war against Japan in August 1945 and entered the Pacific War. There were not much options left for the Azad Hind Government to consider, yet they met over and over again to discuss options:

1. Netaji will stay in Singapore and surrender to the British Army with all his military and civil staff.

2. He will stay in Singapore but remain underground under the protection of his followers.
3. He will move to Siam and stay in Bangkok (the King of Siam had actually offered him a safe sanctuary) disguised as a monk in a Buddhist monastery, until the dust is settled.
4. He will fly to Manchuria with his cabinet colleagues and try to negotiate surrender to the Russian authorities.

The 'final decision', according to S. A. Ayer, Publicity Manager of the Azad Hind Government, was 'out of Malaya definitely, to some Russian territory certainly, to Russia itself, if possible. Netaji conceded that it would be an 'adventure into the unknown''.

The next morning, August 16, 1945, Netaji signed and issued the following order: "During my absence from Syonan (Singapore), Major General M. Z. Kiani will represent the Provisional Government of Azad Hind." It may not be out of place to mention here that arrangements were made to distribute sufficient money to INA soldiers and civilians affiliated with the Provisional Government, to see them through at least six months. He also made it sure for the five hundred women of the Rani of Jhansi Regiment camp in Singapore and the forty-five cadets he had sent to Tokyo for training in the army and the air force to return to their families with adequate funds and provisions. That day he arrived at Bangkok in the afternoon. On August 17, he took off from Bangkok airport and arrived Saigon. According to Leonard Gordon : on August 17, 1945 Netaji arrived Saigon to find out that there were no arrangements made by the Japanese for him to move to Manchuria. It was mid-morning. He went to the home of an Indian Independent League member, where he shaved, bathed and went to sleep. But he was awakened within an hour with word that a plane was warming up at the airfield. In that plane there was an army officer named General Tsunamasa Shidei whose task will be to negotiate the surrender of Japan's Kwantung Army, and who will therefore be in a position to introduce Netaji to high-ranking Russians. Initially, Netaji had requested for a plane for all his Cabinet members to fly together. But today, he was offered only one seat. Netaji refused to board the plane and negotiations followed. Eventually, he was offered one more seat and an assurance that another plane will be made available for the rest of his men to fly as soon as possible. Everybody was in a hurry to get away from Saigon. Netaji selected Colonel Habib-ur-Rahman to accompany him, not his old submarine met Major Abid Hasan. Per Sugata Bose, he might have picked Abid Hasan, his submarine voyage companion, but Habis held the higher military rank and had served as his deputy chief of staff in Singapore. It was a twin-engine bomber of the type known as Sally. The five members of Netaji's Cabinet who were left behind were hoping to join their leader in a day or two, but it was not to be.

The plane carrying Netaji and others landed at Touraine airfield (now Da Nang) in Vietnam in the late afternoon on August 17, 1945. The pilot decided to spend the night there and attempt to over-water flight to Formosa next morning. At Touraine the Japanese crew lightened the plane by removing the machine guns and some of the baggage. At five the next morning, Saturday 18th of August, 1945, the plane took off again with its crew of four, its six Japanese army officers and two Indians, and arrived at Taipei six to seven hours later. At Taipei, while the crew refueled and checked the engines (the port one ran a little rough), the passengers ate lunch in a tent. They boarded again about two-thirty in the afternoon.

Peter Ward Fay wrote: "Bomber or no, the twelve men plus the remaining baggage and a full load of fuel were almost more than the Sally, which was old and tired, could manage. Nearly out of the runway when at last it lifted into the air, it climbed steeply, both engines laboring, and at less

than a hundred feet lost the port propeller, which tore loose with a noise like a backfire. A wing dropped. The plane dove, stuck the ground, and broke in two. Shidei, pilot, and copilot died instantly. Habib-ur-Rahman was knocked unconscious, but regain consciousness soon and tried to lead Bose out the back. Baggage blocked their way so they turned and made for the front, which by now was on fire. Habib reached the ground safely. Gasoline, however, had soaked Bose's uniform, the uniform caught, and by the time he struggled free he was a living torch. Habib tried to beat the flames out with his hands. Bose seemed unable to help himself. Habib noticed that his face was battered and cut.

"Men came in trucks and carried the survivors to an army hospital. There Japanese doctors did what they could for Subhas Chandra .....He had third-degree burns over most of this body.... For several hours he was conscious and quite clear in the head, though in terrible pain. Then he sank into a comma. Habib, who was lying the same room with burns on hands and arms, told Ayer later that Netaji spoke to him before he died. "Habib," Ayer's rendering goes, "I have fought all my life for my country's freedom. I am dying for my country's freedom. Go and tell my countrymen to continue the fight." Fay continued: "it is possible Bose never spoke at all. But we can agree with Leonard Gordon that these were the words he would have wished to say, and would have prepared himself to say... He died between nine and ten that evening. It was still Saturday, the 18th (of August, 1945).

Let us look at Sugata Bose's book: "He (Netaji) stood outside the plane with clothes burning and tried to unbuckle the belts of his bushcoat round his waist. Habib's hands were burned in the process of trying to help him. As he was fumbling with the belts, he looked up and his heart nearly stopped when he saw Netaji's face, "battered by iron and burnt by fire." A few minutes later, they both lay down exhausted on the ground of Taipei's airfield..... The next thing Habib knew, he was lying on a hospital bed next to Netaji. For the next six hours, Netaji slipped in and out of consciousness. During those hours he never once complained about the wrenching pain he must have been suffering. In a delirious moment, he called for Abid Hasan. "*Hasan yahan nahi hain, Sab, main hun, Habib*" (Hasan is not here, Sir, I'am Habib) - Habib-ur-Rahman explained to him.

Netaji told Habib in Hindustani what Ayer had quoted as saying that he had fought for his country, etc....At about nine that evening, Netaji's mortal end came, peacefully." Habib tried to fly Netaji's body either to Singapore or to Tokyo. But it did not happen. At last Habib had to consent to a cremation in Taipei. The cremation took place on August 20; Netaji's ashes were placed in an urn and kept in the Nishi Honganji temple, close to the hospital. On September 5, Habib boarded an ambulance plane in Taipei with Netaji's mortal remains, on his journey to Japan. The urn was eventually taken to Renko-ji temple in Tokyo.

There have been controversies, as Ayer had predicted, about the death of this revered Indian leader. Many people still believe that Netaji survived that plane crash and went hiding. But, why would the Japanese lie? Most importantly, why Habib-ur-Rahman would lie? To this writer, the more important issue today is to examine the fruits of Netaji's efforts. There is no denying the facts that the British left India because of the influence of Azad Hind Fauj (AHF) on the Indian armed forces. The British administration could not trust the Indian army any longer after 1945, which had been the backbone of its power. This writer hopes that one day AHF's contribution to the India's freedom would be recognized and the thousands of men and women who died fighting the British to free India under the banner of Azad Hind Fauj will be honorably remembered and given

due place in the country's history. Can there be an "***Azad Hind Gate***" built in Kolkata, similar to the "Victory Gate" in Paris, initiated by Napoleon Bonaparte, to pay belated homage to the fallen Heroes of Azad Hind Fauj? ***Jai Hind !***

Author's Note: *1. Professor Peter Ward Fay obtained his PhD in History from Harvard University and taught History at the California Institute of Technology. He also taught at the IIT Kanpur for 2 years. He did extensive research on the subject and personally interviewed some of the INA survivors including Lakshmi Swaminathan Sahgal, Prem Kumar Sahgal. 2. Professor Sugata Bose (son of Sisir Kumar Bose) teaches History at Harvard University and personally interviewed many INA survivors including Habib-ur-Rahman, Abid Hasan, S.A. Ayer, Lakshmi Swaminathan Sahgal, Prem Kumar Sahgal. 3. Hugh Toye was a British Intelligence Officer posted in the South East Asia during the Second World War and personally interrogated many of the INA prisoners of war captured in 1945. 4. Professor Leonard Gordon taught History at Brooklyn College, The City University of New York; Associate Director of the South Asian Institute, Columbia University, etc. He is an award-winning writer.*

Bibliography:

1. Professor Peter Ward Fay - **The Forgotten Army - India's Armed Struggle For Independence**, University of Michigan Press, Ann Arbor.
2. Professor Sugata Bose - **His Majesty's Opponent**, The Belknep Press of Harvard University Press.
3. Hugh Toye - **The Springing Tiger**, Cassell, London
4. Professor Leonard Gordon - **Brothers Against The Raj**, Columbia University Press, New York.
5. Professor Joyce Lebra - **Jungle Alliance - Japan and the Indian National Army**, Asia pacific Press, Singapore.

Author is a Chicago-based writer and journalist.

Koenigsee

Jill Charles, Chicago, IL

Years ago at the art museum,
I saw Koenigsee in a golden frame
A fairy tale lake, blue as moonstone,
In the piny Wartzman Mountains
The secret lake of Bavarian kings
In a far corner of Germany.

"I'd love to go there," I said.
"But I never will. I can't afford that."

You told me to go,
To seize my dream
Like a hobo hopping a train.
Wanderlust took my hand
And I peeled off my job, my apartment,
My city, my country.

Across the Atlantic,
Through the Tyrol meadows
On a sleek German train
I hiked for miles past pale birches
And half-timbered houses.
Past the tourist buses,
And silent electric boats,
The clear blue lake stretched out.

I picked a golden Schuesselblume
And sank my toes in the cold April water of Koenigsee.
I knew then that I could go anywhere
And the lake looked just like the picture.

If Our Hearts Travel

Jill Charles, Chicago, IL

There is another country
In this one
You can walk or go by bus
You can reach it if you listen.

Every language sings
You know the feeling
If not the punctuation.

There is another country here
You can taste it if you try
In falafel and tahini
In pistachios from Rome
In baklava jeweled with honey
The soup pot in every home.

You are welcome in the game
Children from Iraq, El Salvador
Playing tag or hide and seek
Kick and chase the soccer ball
As they recognize each other
The parents nod and smile.

Men drew borders on the map
States and nations come and go
If our hearts travel every day
The whole world will be home.

A Journey With No Return

Mohan S. Kharbanda, Austin, TX

From time immemorial, we were people of Chenab River – one of the five rivers of Punjab, India. Chenab holds a special place in every Punjabi's psyche. Its very name, Moon River in English, and folklore about tragic loves on its banks (Heer & Ranja, Sohini & Mahiwal) associate the river with mythical romantic powers. My father was born in Gajj Da Kot across one bank of Chenab and my mother in Chaniott on the other. My grandparents moved downriver to Lyallpur after the English governor of the state, Sir Charles James Lyall, founded it.

I was born in Lyallpur in 1946. The family had by then long put down roots in the new city and become affluent. Our family lived in a large estate in Lyallpur with multiple floors and bedrooms. One of the significant features of our house was modern plumbing that included a Western flushable toilet – a novel feature in late 1930s.

I was 18 months old when India was partitioned. The story below is what I have learned from my family.

In early August 1947, a train of half-alive Muslim refugees arrived in what is now Pakistan. They told a harrowing tale of murder, arson and rape on the other side. The Muslims of Lyallpur vowed revenge. Later that month occurred the great massacre of the Hindus and the Sikhs of Lyallpur. Sikhs were especially singled out. They could be easily spotted.

That week, a neighborhood near ours was attacked by a mob, led by a Muslim Sub-Inspector. In the evening, the family could see a huge wall of smoke and flame rising to the sky. Throughout that night Muslim groups armed with guns, pistols, spears, hatchets, and bamboos wandered about the streets attacking and setting fire to the Hindu and Sikh owned shops.

As the week advanced, panic buying by Sikhs and Hindus pushed up prices for gold, weapons, horses, and horse carriages. Prices doubled every day.

My father was on the Indian side for business and chartered a plane to fly our extended family out of Lyallpur. In the evening, we left in various horse carriages called tongas. Not all could fit in the carriages, which were soon overflowing. My older brother, 13 at the time, had a new bicycle and had me sit on the bar and hold onto the handle while he steadied me with one hand. My father walked beside us.

As we approached the canal bridge, we saw murdered Sikhs lying on the canal banks. My father, unsure if we would make it safely, gave some of his money to my brother and asked him to bicycle off if we were to encounter a mob.

When we approached the plane, there was pandemonium. The pilot had taken money from the rich among the people at the airport and had already filled the plane. My father, who had chartered the plane and paid in advance, was furious. He boarded the plane with my uncle to argue with the pilot but the pilot shut the plane door and the plane took off with my father and uncle. We were stranded on the tarmac.

With the plane gone, we returned to the house. It was hot in the noon Punjab sun. Mobs were more active in the evenings when it was cooler and we made it home safely.

That week, with the situation worsening, our local community issued instructions to all the residents to jump from the rooftops to the next house and then to the following until they reached the safety of our neighborhood Gurudwara. Women were instructed to wear at least two dresses and hide gold jewelry on their persons. My mother, in our father's absence, did not sleep and moved to the top floor terrace in the evenings to keep vigilance.

In fear, we waited for our father's return. Two days later there was an announcement by the police that they could not protect us. They asked that Hindus and Sikhs either leave for India or assemble at Khalsa College by 4PM, which was set up as a refugee camp. My mother resisted the move – she wanted to wait for father's return. There were no phones or other means of communication then and our father may not have found us had we left for the refugee camp.

That evening as my mother began to cook for us, my father suddenly appeared at the house and said with urgency that we had to leave for Khalsa College right away. It was past 4PM. He had bought railway tickets for us but the railway station was not safe since he had heard the sound of bullets and found Sikhs and Hindus pouring out in the hundreds from the direction of the station as his train arrived in Lyallpur. Apparently Muslim guards had taken over the train station. There was no time to pack or discuss it further. The horse carriage was waiting outside.

The refugee camp at Khalsa College was safer when we arrived but earlier, the Baluch army had molested and abducted a few young girls and looted the refugees of their gold and cash. Sikhs and Hindus decided to kill their young wives and daughters if there was a danger of abduction again.

The college was not set up to house such a large number. It was unhygienic and wretched. Some children fell ill but I was spared. Most did not sleep much at night. We heard distant drums beating all night long, and sometimes the air was pierced by the dreaded cry of 'Ya Ali.'

My sister, about 5 years old at the time, recalls that one of her earliest memories is of watching mother cook food for the family in the camp making use of makeshift bricks and firewood. This was an early indication of the deprivation and hardship the family would endure for the next two decades.

In the camp we learned that our house was sealed to protect it from the looters. It also meant that it was already earmarked for a police officer or a politician. We were at the camp for roughly three weeks. Sporadically, buses were arranged at exorbitant prices to take refugees to the new Indian border. There was a mad rush to board the buses when they arrived. It cost Rs 600/head (current prices over Rs100,000) for the bus ride– a very large fortune in those days. In the melee my brother and sister, 13 and 10 respectively, boarded a bus for Amritsar. It left before anyone else from the family could board. Many families were separated and it took months before they were reunited.

While still stationed at the refugee camp, and after the bloodletting had diminished, we were informed that a military convoy was headed to Amritsar. We walked to the place where the convoy was to commence. We reached quite late and the night was pitch dark. We were informed that the departure was being delayed until 4AM due to security concerns.

Mother decided to put us to sleep and went to the camp to fetch some blankets from the camp so that my siblings and I could sleep on top of them rather than on the floor. It was a dark night and she discovered that she had followed a wrong distant light and had reached a place called 'Clock Tower', where she was confronted by military. She was threatened to turn back else she would be shot down. Trembling with fear, she somehow found her way back to the place where the convoy was to commence the next morning.

The next morning, the convoy commenced on route to Amritsar. There was a mad rush again and not enough room on the military vehicles. Some of our extended family and my second oldest sister were able to board and left for Amritsar.

My parents and the remainder of the family left a few days later. It was slow moving. We saw caravans moving in both directions. They consisted of thousands of refugees who walked 8-10 people abreast. Some brought their livestock with them. On route to Amritsar, the family saw a well filled with dead bodies of women who had plunged alive to save their honor. It was said, with Punjabi hyperbole, that our beloved Chenab River was red in color for days due to the wounded and dying floating bodies.

It was the longest August for our family but at the end of the month we were rejoined at the family shop in Amritsar. But not everyone was so fortunate. My aunt (mother's sister) was killed, along with her family, except for one son who survived by faking death. His was a harrowing tale. He survived for two months - alternately sheltered by Muslim friends and hunted by others before he made a safe passage to India. During his hiding, he heard rumors that his sisters were abducted and alive. We made attempts to locate them but never found them. This remained a private wound for my mother.

For months after we moved to Amritsar, the news of killings and losses continued to come.

****

Our father's friend offered to have us stay on the first floor of his house. Stress, and hygiene conditions took their toll and most of us, including me, were sick and down with diarrhea. One of my sisters had typhoid. My younger brother was born in this house.

My early memories began to take shape around this time. Golden Temple, as we know it today, is usually crowded. However back then, it was crowded several times over with hardly a room to move. It was a much sought after place by every refugee even two years after partition.

Two generations have passed since partition but I know that we were shaped by its aftermath for better and ill. We experienced many moves (Amritsar, Jaghadhari, Bombay, Saharanpur and then back to Bombay) in the next four years, a period of general uncertainty and deprivation. My father tried his hand at businesses but they were not to succeed. He sold the shop, mother's jewelry and eventually became an accountant for Rs 80/M. Later my older brother, still in his teens, joined the same company. My eldest uncle assisted us financially when required.

Later we moved to Jagadhari to try our luck in business again and lived with my grandparents in a tiny room. When that did not succeed, the family split for a few years. Father and older two brothers moved to Bombay and my mother and the younger siblings moved to a house allotted to us for refugee settlement in Amritsar. I was eleven years old before we could afford to all live together again.

During this time, my older brother and sister, after they finished tenth grade, became schoolteachers at new schools for refugees. One brother worked as a ticket checker for the Indian Railways. My sister and I bound books part time. We were ten brothers and sisters and it was tough for the two brothers in the middle to study with multiple moves and schools in different states with their own medium of instructions. But the family continued to sacrifice and persevere and had the younger ones focus on studies. Over the years, with help from scholarships and part time work, eight of us armed ourselves with college degrees and found ourselves a part of the emerging Indian urban middle class. My four older siblings stayed in teaching positions so that the younger ones could pursue professional careers in sciences.

I was perhaps the luckiest and finished engineering at IIT and in 1971 moved to the United States for an MBA with a bank loan guaranteed by a family friend who had done well.

****

In my teens, I used to wake up with nightmares but I also know that my story is only one of roughly 14 million. Studies in the West have shown that refugees the world over, like abused children, suffer from high cortisol (a stress hormone) and blood pressure. Muslims suffered equally. There were no winners. We were all a part of the largest migration in human history. One caravan alone had 400,000, refugees, so large in sheer number that it took about 12 hours to pass a given spot on its route. A million perished. In six weeks, half as many Indians and Pakistanis lost their lives as Americans did in four years of WWII.

India has forgotten about partition but it is alive in the lives of people who made this journey with no return. My siblings and I were denied childhood. Our pre-partition wealth has eluded us but we don't crave it. Partition has been a terrible reminder as to how terribly delicate is the fabric of civilization, of the vigilance required to protect it and of the painstaking work of mending it once it has been torn. It is a lesson we were supposed to have learned after Nazi Germany but it has been repeated after partition in Bosnia, Rwanda and the Middle East. Perhaps we are fated to forget and relearn. On a positive note, partition has forged among us work ethic, frugality, facing adversity with courage and a strong sibling bond.

I know the defining moment of my history is receding with each passing year. The next generation has its own sensibilities where partition is just a footnote. Perhaps it is for the better. We have made ourselves anew as each generation must. Wish the parents had lived to see it.

Mohan has held key leadership positions in both the emerging and developed world. He has Built and operated Greenfield businesses in Brazil, India, China and Japan in addition to managing business units in the United States. Mr. Kharbanda received a bachelor's degree in mechanical engineering from the Indian Institute of Technology and a master's degree in business administration from the University of Minnesota. He has been a guest speaker for the executive marketing program at the Columbia Graduate School of Management in New York and has advised the governments of Ghana, Bangladesh, Mexico and Nepal through WorldBank. Mr. Kharbanda has served on the boards of MedData, eMids and Utopia Inc; is the past Chairman of the Texas Asian Chamber of Commerce and currently serves on the advisory board of UT business school Center for Global Business. He has contributed to some business and political journals.

Book Worlds

Carla Jankowski, Chicago, IL

The world is a book, and those that do not travel read only one page.

— St. Augustine

For most of my life the only way I had seen the world was through the eyes of those who have written about it in books I found at the library or bookstore.

I was an armchair traveler, reading one tale of adventure after another; yet, wondering when I would finally be able to go beyond that "one page" and really see the world.

As my students read during their sustained silent reading time in English class, I sat at my desk spending time in India with Bharati Mukherjee and Clark Blaise. For 10 minutes, four times a day I read *Days and Nights in Calcutta*, a memoir of their yearlong visit to Mukherjee's homeland.

Then I was brought back to the reality of the classroom. Sometimes, to encourage my students, I would share a favorite line or image from the book I was reading. Usually they would yawn and politely nod.

That's why I was surprised when Magdalena asked if she could borrow my book after I was done reading it.

Maggie had shown me the snapshots of the little village in Poland where her family had lived before coming to the United States. She was a serious student, but I didn't think any 15-year-old could possibly be interested in the political, cultural, and marital tensions Mukherjee and her husband experienced in India in the early 1970's. I was usually trying to coax my other students into finishing just one book during the entire semester. Maggie seemed different.

So, of course, I lent her the book.

Over the next seven years I continued teaching, finally venturing out on my own to Eastern Europe and Japan, but still reading about places I someday hoped to see.

On a cold night in February, I sat at my desk at home, reflecting on the day's tensions. It hadn't been a good one.

I decided to check my e-mail and found a new message from Maggie. She had gone on to college and occasionally kept in touch with many of us who taught her, somehow remembering our birthdays and sending us e-mail greeting cards.

This one included some photo attachments.

There on the screen . . . in full color . . .was Maggie . . . smiling on a cloudless sunny day . . . against an iconic travel background . . . unmistakable ivory white spherical domes . . . flanked by exquisite looming spires . . . reflected in a long, narrow, glassy pool . . . *the* Taj Mahal!

She said that reading that book had inspired her to travel to India, and she thanked me for lending it to her.

And now she inspired me to *turn another page . . .*

Dedicated to Bharati Mukherjee (July 27, 1940 – January 28, 2017)

Carla Gubitz Jankowski lives in Oak Park, Illinois. She taught high school English and journalism for 20 years and led teacher staff development workshops in reading and writing through the Chicago Area Writing Project and Governors State University. She holds a BA degree from the University of Illinois (Urbana) and MAT from the University of Chicago.

After retiring eight years ago, she has facilitated a writing workshop for adults at Bezazian Library in Chicago's ethnically diverse Uptown neighborhood. She focuses her own writing on reflections of personal memories. "Book Worlds" originated as a script for a digital story she produced in 2004, and she is still waiting for her own trip to India.

Is This Bliss?

Kathy Powers, Chicago, IL

The mastery of energy
The power of a mantra
The beauty of humanity
The honesty of passion

I feel pulses of my life
My not-dead-yet beliefs
Strong brainy wisdom freely flows
My love, hypomania

These blameless, happy impulses
Spur me on a course
To help myself and others now
Whilst I remain untouched

Oh yes, I always take my meds
I skip along steep cliffs
To me, I'm soaring with the breeze
With persistent connectedness.

A Sacred Appearance

Bakul Banerjee, Chicago, IL

Rumor has it that tonight is the night
to watch for the ancient beast. We wait
on the red earth shore, bathed
by the glowing sun, to be amazed.

Devotees came by cars and buses
with gifts of fruits and incense
seeking miracles and blessings.
Scientists traveled with machines
to measure its carapace and genes
to find what makes them live so long.
Other curiosity seekers came along.

But, the turtle never emerged after sunset.
We turned into insignificant silhouettes.

Panchajanya : A Drama Review

Balarka Banerjee, Sydney, Australia

Can there ever be a distinction between religion and state? Can they co-exist? Is there any purity in politics? Or does power corrupt all, even the purest of heart? How high an individual cost can be suffered for the greater good? Is god in human form truly divine and infallible or weak and flawed like every other human? Nandikar's latest production “Panchajanya” asks these complex and urgent questions through imaginative re-telling of one of the oldest stories in the world the life and times of Lord Krishna. This original production directed by Sohini Sengupta, depicts the life of Krishna and the key events that shaped him and also perhaps the nation of Bharat itself. The play focuses heavily on the early events of Krishna's life, as we see him initially as an energetic, idealistic young man in Gokul and Vrindavan, spending time with his “rakhaldol” as well as Radha and the Gopis. However,Krishna is also a fighter and a strategist as he transforms himself gradually into a fierce warrior and defeats his foes, Kansa and Jarasandha. The second half of the play shows a much older, wearier version of Krishna. Certain key events of the battle of Kurukshetra are depicted but the story moves quickly on to the aftermath of the events of the Mahabharat and focuses on the end of Krishna's life as he struggles with the choices he has made, the consequences of his actions and his failings.

Panchajanya is presented as a musical and it uses songs and dances brilliantly to great effect. Many key action set pieces are presented with incredible style and impact through well-choreographed dance sequences. The play effectively creates several “moments” through beautiful use of music, voice-overs, dance, lighting and martial arts. These techniques come together impressively in scenes such as the death of Kansa, the death of Jarasandha, and Abhimanyu's battle creating sequences that are guaranteed to stay with you for a long time after. The play moves at a fast pace, jumping back and forth between times and places, always propelling the plot forward briskly. The entire production has a relentless energy that captures your interest and holds your excitement from start to finish. Despite the highly dynamic and often action packed scenes, the play also succeeds in pushing home its ideological, philosophical and political subtext very effectively. The dialogue is complex and deep but never excessive. There are layers and layers of political metaphor in the script, which the audience is entrusted to peel back as they watch the production and possibly a long time after the curtain has fallen.

The performances are universally commendable. Shohini takes on the challenging task of not only directing, but also acting in the crucial roles of Radha and Draupadi. Rudraprasad Sengupta as Jarasandha and Swatilekha Sengupta and Gandhari as usual give towering performances, in albeit smaller roles. The stand out performances however were the two Krishna's, as they accomplished the complex feat of portraying the same character in two almost conflicting ways, highlighting nuanced similarities and differences. Saptarshi Maulik gives a bravura performance as the young Krishna that is truly s standout. On the other hand, Partha Pratim Deb (who also wrote and co-directed) fleshes out all of the conflict heart break and pathos of the character of Krishna towards the end of his life. A special mention must be made of the many younger actors and actresses in the production who were crucial in providing a sense of energy and an epic feel. Their

highly accomplished and often very challenging performances took the production to a level rarely seen in Bengali group theatre. Lights, music, sound, costume and set design is highly innovative as it blends elements of the contemporary and the classical. Dreadlocks, tribal face tattoos and even biker masks are used at the same time as dhotis and ghagras. This gives the whole production an unusual sense of place and time and makes it feel much more immediate and relatable.

Panchajanya comes highly recommended. A theatrical feast that is visually awe inspiring but also intellectually challenging, and should be remembered as an instant classic. Panchajanya is being performed regularly in Kolkata as well as other cities of India, and one should not miss an opportunity to have an unforgettable theatrical experience.

Author thankfully acknowledges Nandikar Group for providing information about their cast and team.

Balarka Banerjee is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

Santa's Fusion Fantasea : A Food Road Trip

Balarka Banerjee, Sydney, Australia

Kolkata these days is in the middle of some form of foodie golden age. The number of restaurants have steadily and rapidly increased. A lot of the old classics institutions are going through a revival and taking on the fresh new and innovative restaurants and cafes that are cropping up all over. The one thing that has also exploded as a result, is the sheer diversity and variety that is on offer. Be it sushi, fajitas, farfalle or paellas, you can get it all. In this crowded market it has become increasingly difficult for new restaurants to make mark with a truly novel concept and cuisine.

This is precisely why the success of Santa's Fantasea is a standout. To learn more about their food, philosophy and passion we met with one of the owners, Kaushik Ghosh for a meal at their new branch Santa's Fusion Fantasea near Vivekananda Park. The restaurant is a large 3 storeyed building with each floor decorated in a different theme with large impressive murals, sculptures, clever lighting and unique furniture made reclaimed wood. The main draw for Santa's restaurants is their cuisine which is Indian tribal food. To be honest I, like probably most people, had little or no knowledge about tribal food. I was entirely unsure as to what to expect and I was particularly curious as to what lead to this choice of cuisine for their restaurant. Over a delicious mocktail, Mr. Ghosh told us his story, about how he started off with tiny but successful seafood restaurant, without any formal training. He then opened up a much bigger restaurant in Golpark and designed a menu inspired by Indian tribal cuisine. Mr. Ghosh and his business partner Avijit Saha have travelled extensively throughout India, particularly focussing on the many indigenous people that still live in remote parts of the country. They spent time in the community, integrating with them and learning their food. However, introducing a previously unheard of menu in Kolkata is a courageous move as most customers tend to prefer the tried and tested favourites. Although initially foot fall was low, their popularity increased gradually as word got around. Soon the Golpark branch was getting filled out regularly which lead them to open these other two outlets.

Mr. Ghosh had already ordered some of his signature dishes and the first and probably the most iconic ones came out to us. The dish is call "Bansh Pora Manghso" or "bamboo smoked goat meat", adapted from the tribal people of Odisha. The dish consists of a joint of young bamboo stem, split in half and filled with marinated goat meat. The bamboo joint is then put back together and smoked on an open flame. Not only was the dish visually theatrical, the taste and aroma was something memorable. The meat itself was cooked tender and the spicy marinade was exciting and complex. It was very evident that a number of spices and fresh herbs were used in perfect balance. But the real standout flavour was the smokiness from the bamboo itself. Smoked bamboo is not a flavour I have had before in smoked meats and I was not sure how it would compare, but the truth is that the flavour worked especially well with the dish.

The unique spices and herbs that were used in the dish made me curious as to how they went about sourcing his materials. Furthermore, the menu focussed heavily on seafood including fresh octopus, crabs and squid which are not common in Kolkata. Mr. Ghosh explained the challenges of sourcing special spices and how he had spent months and years establishing networks all over India to secure his supply, down to the actual bamboo stems itself. The fresh seafood is largely sourced from Orissa, brought in to the restaurants in the early hours of the morning. Maintaining quality and standards is indeed hard work.

The next dish we tried was the "fish ngatok". Originally a dish from Nagaland, it is fish coated with herbs and cooked inside a banana leaf. The banana leaf technique, as expected adds a subtle smokiness as well as keeps the fish juicy and perfectly cooked. The coating of the fish was once again a perfect blend of aromatic herbs with strong citrus notes. You can pick up notes of lime zest, lime leaves, lemon grass and many others.

We were eventually joined by Mr. Saha as we started hearing more of their travel stories. Their entertaining adventure tales could easily have been made into a "Food Network" series anywhere else in the world. They recounted stories of the strange and wonderful food experiences they have had over the years. Such as, how the meat in the original version of the "Bansh Pora Mangsho" is supposed to be squirrel and how one of the tastiest things they have ever eaten is a type of wasp. They were out on a road trip for almost a year, gathering knowledge and experience. They commented on how friendly and inviting tribal people are in general, and how all it takes is sharing a drink of some home brew liquor.

The final dish we enjoyed was “Nalli kebab”. The dish consisted of two lamb shanks, initially slow cooked and finished off in an oven. The spice combination this time had a definite north Indian flavour to it. The meat itself was falling off the bone, tender and moist. The dish is rich and satisfying and would be a hit with any meat lover. That brought us to the end of an excellent meal. There were still several items on the menu which drew our interest, such as tribal rice, octopus, and sweet pudding made out of onions, but unfortunately we were all very full. The entire meal was a special experience. The noticeable thing about each dish was how well the flavours were balanced, while being bold and new. The flavour profile was distinct for each dish and it was evident that a great deal of research and thought had gone into each dish. The other stand out was the respect that was shown towards the produce. Not only is each produce painstakingly sourced, it also treated extremely well in each dish. The fish and meat was cooked perfectly and was always the star of the dish. The portions are generous and prices quite reasonable (most main being Between Rs 200-400). The service was knowledgeable and attentive and we were told that they are open to accommodating large groups or functions as well.

The Santa's restaurants have achieved something rare, introducing an almost unheard of cuisine in India and make it into a success, challenging people's palettes. We made a mental not to come back as soon as possible to try out one of the other interesting dishes. So if people want to be a little bit adventurous and try out food that is delicious as it is rare, then Santa's Fantasea comes highly recommended.

"Happiness. Simple as a glass of chocolate or tortuous as the heart. Bitter. Sweet. Alive."

— Joanne Harris, Chocolat

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে